উপন্যাস

নীলু হাজরার হত্যা রহস্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১- ৫ নির্জন এক নদী 2

৬-১০ শুয়ে বসে সময় কাটাচ্ছে বৈশম্পায়ন............. 48

১১-১৫ প্রথম থেকেই মিটিং.......................... 111

১৬-১৮ অনেক দুঃখের কথা......................... 148

১- ৫ নির্জন এক নদী

০১.

নির্জন এক নদী সারাদিন এলোচুলে পা ছড়িয়ে বসে মৃত্যুর করুণ গান গায়। চারদিকে নিস্তব্ধ এক উপত্যকা, দুধারে কালো পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে আকাশে। এই বিরলে শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের মতো হু-হু বাতাস বয়ে যায়। অজস্র সাদা ছোট বড় নুড়ি পাথর চারদিকে অনড় হয়ে পড়ে আছে। খুব সাদা, নীরব, হিম, অসাড় সব পাথরের মাঝখান দিয়ে সেই নদী–উৎস নেই, মোহনা নেই। সারাদিন এখানে শুধু তার করুণ গান, মৃদু বিলাপের মতো। কিছু নেই, কেউ নেই। শুধু হাড়ের মতো সাদা পাথর পড়ে থাকে নিথর হয়ে। উপত্যকা জুড়ে এক মৃত্যুর সম্মোহন। এলোচুলে পা ছড়িয়ে বসে নদী অবিরল গান গেয়ে যায়।

আনমনা আঙুল থেকে আস্ত সিগারেটটা পড়ে গিয়েছিল ফুটপাথে। সিগারেটের আজকাল বড্ড দাম। তার ওপর এটা বেশ দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট। শখ করে কিনে ফেলেছে বৈশম্পায়ন। আনমনেই বৈশম্পায়ন সেটা কুড়োতে নিচু হয়েছিল। শর্মিষ্ঠা দশ পা পেছনে, ছেলের বায়না মেটাতে ফুটপাথের দোকান থেকে মোজা বা গেঞ্জি কিনছে, আর অনবরত মৃদুস্বরে ধমকাচ্ছে ছেলেকে। দশ পা এগিয়ে এসেছে বৈশম্পায়ন। দশ পায়ের বিচ্ছিন্নতা। সিগারেটটা কুড়োতে হাত বাড়িয়েও সে ফিস ফিস করে বলল, ইট উইল নট বি এ ওয়াইজ থিং টু ডু মাইডিয়ার।

কুড়োনো হল না। নতুন একটা যে ধরাবে তাও হল না। এরিয়ালে এসে লাগল সেই মৃত্যু-নদীর গান। সাদা নিথর হিম পাথর সব মনে পড়ে গেল।

ডুমকি এখন অনেক দূরে। কারশিয়াং-এ। ডুমকির জন্য বড় হু-হুঁ করে ওঠে বুক। মানুষ তো পাখি নয় যে, উড়ে যাবে। ডুমকির সঙ্গে এই অনেকটা অসহায় দূরত্ব এই মুহূর্তে ভীষণ টের পায় বৈশম্পায়ন।

দশ পায়ের দূরত্বে শর্মিষ্ঠা এখনও কী যে কিনছে। কই এসো, বলে তাকে এখন একবার তাগাদা দেওয়া যায়। কিন্তু সেরকম কোনও ইচ্ছেই হল না বৈশম্পায়নের। থাক, কিনুক। ছেলে বুবুম একবার ফিরে দেখল বাবাকে। তারপর ঝুঁকে পড়ল দোকানের জিনিসপত্রের ওপর।

বৈশম্পায়নের পকেটে গোদরেজের চাবি। পকেটে হাত পুরে চাবির রিংটা মুঠো করে ধরে থাকে সে কিছুক্ষণ। তার ফ্ল্যাট মোটামুটি নিরাপদ। প্যান্টের চোরা পকেটে বোনাসের দেড় হাজার টাকা। চাবির রিং ধরার ছলে সে দেড় হাজার টাকার ফোলা অংশটাকেও স্পর্শ করে আছে। কিন্তু এরিয়ালে নির্ভুল গানের তরঙ্গ ভেসে আসছে। হারিয়ে যাচ্ছে গোদরেজের চাবির নিরাপত্তা, টাকার মূল্য। বৈশম্পায়ন আর একটা সিগারেট বের করে।

সিগারেটটা ধরানো হল না কিছুতেই। আকাশ এখন কেমন? ছেঁড়া মেঘের তুলো গড়িয়ে যাচ্ছে নীল বেডকভারে। এখনও বৃষ্টির স্যাঁতা ভাব উবে যায়নি ফুটপাথের শান থেকে। শরৎ সবচেয়ে প্রিয় ঋতু বৈশম্পায়নের। তার প্রিয় হল টাকা, প্রিয় ডুমকি আর বুবুম। প্রিয় হোক বা না হোক অবিচ্ছেদ্য হল ওই শর্মিষ্ঠা। তার আরও কিছু প্রিয় আছে, তবে সবসময়ে একরকম নয়। তার প্রিয় রং সাদা। প্রিয় রাগ হংসধ্বনি। প্রিয় অভ্যাস বসে থাকা বা ঘুম। এই শরতের প্রিয় রোদে বউ আর ছেলেকে নিয়ে পুজোর বাজার করতে বেরিয়ে তার আগাগোড়া ভারী ভাল লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ..

শর্মিষ্ঠা দোকান থেকে জদা পান মুখে দিয়ে তবে এল। হাতের জালের ব্যাগে দুটো ছোট প্যাকেট। আস্তে আস্তে প্যাকেট বাড়বে। জালের ব্যাগ উপচে পড়বে। আজ তারা বাইরেই কোথাও খেয়ে নেবে! সারাদিনের প্রোগ্রাম

কিন্তু এখন বৈশম্পায়নের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। চোখের দৃষ্টি একটু অবিন্যস্ত, অস্থির। সে বলল, বাড়ি যাবে?

শর্মিষ্ঠা অবাক হয়ে বলল, বাড়ি যাব? এখনও তো কেনাকাটা শুরুই হল না! বলতে বলতেই সে বৈশম্পায়নকে ভাল করে লক্ষ করে এবং গলার স্বর পাল্টে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

ভরা প্যাকেট ঢোকাতে গিয়ে সিগারেটটা দুমড়ে ফেলল বৈশম্পায়ন। চিন্তিত মুখে বলল, খারাপ লাগছে।

তা হলে চলো। ট্যাকসি ডাকি।

ডাকো।

বলে বুবুমের হাত ধরে বৈশম্পায়ন। পরক্ষণেই মনে হয়, ব্যাপারটা অত্যধিক নাটুকে হয়ে যাচ্ছে। তার শরীর তেমন খারাপ নয় যে, বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকতে হবে। কিন্তু বাসায় ফিরলে অন্তত শর্মিষ্ঠার কাছে মুখ রাখতে তাকে অসুস্থতার থিয়েটার করতেই হবে। তা পারবে না বৈশম্পায়ন। বড় অস্থির লাগছে তার, ভয়ানক অস্থিরতা দেখা দেবে।

শর্মিষ্ঠা ট্যাকসি ডাকতে ফুটপাথের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৈশম্পায়ন বলল, শোনো।

কিছু বলছ?

কেয়াতলা চল। মাধবদের বাসায় একটু বসি। হয়তো সেরে যাবে।

শরীর কেমন লাগছে বলো তো!

অস্থির। বোধহয় পেটে গ্যাস-ট্যাস হয়েছে।

শর্মিষ্ঠা জানে, আজকাল স্ট্রোকের কোনও বয়স নেই, এবং মানুষ যখন তখন মরে যায়। দু চোখে ঘনীভূত সংশয় আর ভয় নিয়ে সে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, বরং কোনও ডাক্তারের চেম্বারে চলো। দেখিয়ে নিয়ে যাই।

বুবুম মুখে আঙুল পুরে উর্ধ্বমুখে বাবাকে দেখছিল। বাবাকে হাতের নাগালে পেলেই বায়না করা তার স্বভাব। কিন্তু এখন সেও কিছু টের পেয়ে গেছে। তিন বছরের বুদ্ধি আজকাল কিছু কম পাকে না। সে চুপ করে চেয়ে ছিল।

বৈশম্পায়ন বলল, ডাক্তার দেখানোর মতো কিছু নয়। একটু রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শর্মিষ্ঠার সন্দেহ গেল না। তবে সে আপত্তিও করল না।

গড়িয়াহাটা থেকে সামান্য হাঁটতেই কেয়াতলার মোড়। মাধবদের বাসা মোড়ের কাছেই।

দরজা খুলল মাধবদের বাচ্চা ঝি। বাসায় আর কেউ নেই।

শর্মিষ্ঠা এই অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। সে বলল, ওরা তো ফিরবে। আমরা বরং একটু বসি।

ঝি শর্মিষ্ঠা এবং বৈশম্পায়নকে চেনে। মৃদু হেসে বলল, বসুন না।

বাইরের ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে ডবল সোফা রয়েছে। বৈশম্পায়ন লম্বা মানুষ। শর্মিষ্ঠা একটু চিন্তিত হয়ে বলে, তুমি বেডরুমেই চলো। শোবে।

বৈশম্পায়ন মাথা নেড়ে বলে, আর না। পাখা খুলে দাও। একটু বসলেই ঠিক হয়ে যাবে।

জল খাবে?

খাব।

শর্মিষ্ঠা নিজেই ডাইনিং স্পেস থেকে ফ্রিজের জল নিয়ে এল। বলল, আস্তে আস্তে খেয়ো। ভীষণ ঠাণ্ডা।

বৈশম্পায়নের ফ্রিজ নেই। কিনবে কিনবে করছে। খুব সাবধানে সে একটু একটু করে অল্প জল খেল। শরীরটা যে কোথায় খারাপ, কেন খারাপ তা ভেবে দেখতে লাগল সে।

বুবুমকে হিসি করাতে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। ফিরে এসে বলল, এদের সবকিছুই এত ঝকঝকে পরিষ্কার! বাথরুমটায় শুয়ে থাকা যায়।

বৈশম্পায়ন এসব কথা নতুন শুনছে না। মাধব আর তার বউ ভালই থাকে। গুছিয়ে থাকে। সাজিয়ে থাকে। কিন্তু এই থাকা না-থাকার কোনও অর্থ আজ সে খুঁজে পাচ্ছে না। সোফায় ঘাড় হেলিয়ে সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে চোখ বুজে সে পাখার বাতাস শুষে নিচ্ছিল। সেইভাবেই রইল।

শর্মিষ্ঠা তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দুধের বোতল আর সন্দেশের বাক্স বের করে ছেলেকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। সারাদিনই তাকে অক্লান্ত চেষ্টা করে যেতে হয়। ছেলে খেতে চায় না। প্রথমে কাকুতি মিনতি বুবুম লক্ষ্মী সোনা! এই একটুখানি..আচ্ছা সেই ছড়াটা বলছি, হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তা হলে সেইটে বলি…চলে মস মস মস মস বাঁ ডান মস মস সবচেয়ে ভাল পা গাড়ি, উঃ…সেই সকালে কখন একটু দুধ খেয়েছে, এত বেলা হল, কিচ্ছুটি নয়! খাও বলছি। খাও। দাঁড়া তো..দেব? দেব পিঠে একটা দুম করে?

এসবই মুখস্থ বৈশম্পায়নের! এরপর মৃদু একটা থাপ্পড় এবং বুবুমের কান্না। সে চোখ না খুলেই বলল, আমার শরীর ভাল লাগছে না। একটু চুপ করো।

শর্মিষ্ঠা আর শব্দ করল না। কিন্তু তার এই নীরবতা রাগে ভরা তাও বৈশম্পায়ন জানে। শর্মিষ্ঠা ছেলেকে নিয়ে খাবার ঘরে চলে গেল।

বৈশম্পায়ন চোখ খুলল এবং প্যাকেট থেকে দোমড়ানো সিগারেটটা বের করে সযত্নে সোজা ধরিয়ে ফেলল।

চার বেডরুমের এই ফ্ল্যাটটা মাধব কিনেছে বছর দশেক আগে। তখন ফ্ল্যাটের দাম দু লাখের কাছাকাছিই হবে বোধহয়। বাইরের ঘরটা দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত বুক কেস দিয়ে সাজানো। কিছু পেতল আর পোড়ামাটির বাছাই কাজ রয়েছে। দেয়ালে কয়েকটা তেলের ছবি, কিছু ওরিজিন্যাল প্রিন্ট। মেঝেয় একটা সত্যিকারের উলেন কারপেট। খুব বড় নয়, তবে বসার জায়গাটুকু ঢাকা দিয়েছে। কার্পেটটির বাইরে ছিট ছিট লাল কালো-সাদা মোজাইক করা মেঝে আয়নার মতো ঝকঝকে। মাধব আর ঝিনুকের ছেলেপুলে নেই।

আমাকে পুষ্যি নে না বলে ঠাট্টা করেছে একসময়ে বৈশম্পায়ন। কখনও আর একটু ফাজিল হয়েছে তোর কর্ম নয়, ঝিনুককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস। কিন্তু এখন আর কিছু বলা যায় না। ওদের আর হবে না তা বোঝা গেছে। তাই আর ঠাট্টা চলে না।

বৈশম্পায়ন খুব বড় একটা শ্বাস ফেলল। গোদরেজের তিন চারটে চাবির গোছা পকেটে থাকায় ফুটছিল। গোছাটা বের করে শর্মিষ্ঠার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে রাখল সে।

আবার চোখ বুজল। তার কি শরীর খারাপ? তার কি মন খারাপ?

খাবার ঘর থেকে বুবুমের অল্পস্বল্প কান্না আসছে। শর্মিষ্ঠা বেশ জোর গলায় ধমক মারল দুটো। বৈশম্পায়ন গ্লাসটা তুলে আবার একটু জল খায়। এখন আর জলটা তেমন ঠাণ্ডা নয়।

মাধবের সঙ্গে আগে যত ভাব ভালবাসা ছিল আজ আর তা নেই। এই পরিচ্ছন্ন ঘরে বসে থেকে বৈশম্পায়ন দূরত্বটা টের পায়। কবে কখন যে আস্তে আস্তে তারা দূরে সরে গেছে তা টেরও পাওয়া যায়নি। কিন্তু আজকাল মানুষের জীবন যাপনের প্রণালীটাই এমন হয়ে গেছে যে, কেউ আর নিকট হয় না কেবলই দূরে সরে যায়।

বৈশম্পায়ন জলের গ্লাসটা নাড়ে। জল ঘুরপাক খায় গ্লাসের মধ্যে। ঠাণ্ডা ভাবটা আরও কমে গেছে। আরও একটু জল খায় বৈশম্পায়ন।

মাধবের বাসায় আসতে তবু ইচ্ছে করে কেন তার? সে রহস্যটা জানে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঝিনুকও কি জানে?

বৈশম্পায়ন নিঃশব্দে ওঠে। পদা সরালেই ওদের সুন্দর শোওয়ার ঘরটি। বারো বাই চোদ্দো ফুট হবে। চার দেয়ালে চার রকম মোলায়েম রং। দুটো সিংগল খাট। মাঝখানে এক চিলতে কার্পেট। ছোট একটা ক্যাবিনেটের ওপর ফুলের ভাস। তাতে টাটকা রজনীগন্ধাও। ক্যাবিনেটের ওপর স্টিলের ফ্রেমে বাঁধানো স্বামী-স্ত্রীর ফটো। বাঁ ধারে ঝিনুক। কী সুন্দর! ঝিনুকের একটা ফটো বৈশম্পায়নের কাছেও আছে। কেউ তা জানে না। স্বয়ং ঝিনুকও নয়। সেই ফটোগ্রাফ আমৃত্যু গোপন থেকে যাবে বৈশম্পায়নের কাছে। যেদিন টের পাবে মৃত্যু আসছে, সেদিন ফটোটা নষ্ট করে দিয়ে যাবে সে।

দরজার বাঁ ধারে একটা চমৎকার শো-কেস। তার ওপর গাররেডের রেকর্ড চেঞ্জার। তার পাশে নীলুর ছবি। মাধবের কিশোর ভাই। খুন হয়ে গেছে।

নীলুর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ঝিনুককে বহুক্ষণ ধরে দেখে নেয় বৈশম্পায়ন। এই এক মুখ। দেখতে দেখতে মৃত্যু ভুল হয়ে যায়, জীবনের তুচ্ছতাগুলির কথা মনে পড়ে না, দুঃখবোধ থাকে না। বুক ভরে ওঠে আনন্দে।

সে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, এ কি কাম? এ কি পাপ? এ কি বিশ্বাসঘাতকতা?

মাধবের যখন বিয়ে হয় তখন বৈশম্পায়ন ডবলিউ বি সি এস পাশ করে বাঁকুড়া জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি করছে। আজও সেই চাকরি করে যেতে পারলে ভাল হত। ঝিনুকের সঙ্গে ফিরে দেখা হত না।

কিন্তু এ কেবল ইচ্ছাযুক্ত চিন্তা। দেখা হতই। দেখা না হলে হত কী করে? আরও কয়েকটা জেলা মহকুমা ঘুরে প্রোমোশন পেয়ে এই কলকাতাতেই আসতে হত তাকে। তার আগেই অবশ্য সে এল। আলিপুরদুয়ার কোর্টে গণধোলাইয়ের পর কিছুদিন হাসপাতালে কাটিয়ে ভাঙা হাত আর জখমে শক্ত হয়ে ওঠা ঘাড় নিয়ে সে কলকাতায় চলে এল পাকাপাকি। একটা ব্যাঙ্কে বরাতজোরে চাকরি জুটে গেল। এ সবই নিয়তিনির্দিষ্ট, আগে থেকে ছক বাঁধা।

শর্মিষ্ঠা এসে বলল, শরীর কেমন লাগছে?

ভাল। অনেকটা ভাল।

আর একটু বসবে?

বসলে ভাল হয়। ওরা কি ফিরবে?

ঝি তো বলছে ফিরবে।

একটু বসি। ওরা ফিরলে উঠব।

বুবুমের ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাড়িয়ে দাও।

আজ আর পুজোর বাজার হবে না মনে হচ্ছে।

তুমি একা গিয়ে কিনে আনো না।

এতে একটু সতেজ হয়ে শর্মিষ্ঠা বলে, যাব? বুবুমকে কে দেখবে?

দেখার কী? আমি বসে থাকব, ও ঘুমোবে।

দোনোমোনো করে শর্মিষ্ঠা বলে, তোমার মায়ের কাপড় যদি তোমার পছন্দমতো কিনতে না পারি?

পারবে।

ঠকে আসলে বকবে না?

মেয়েরা একটু তো ঠকেই। আজ কিছু বলব না। যাও।

কার জন্য কী যেন?

জয়ের জন্য একটা ভাল প্যান্টের পিস আর শার্টের কাপড়।

প্রতিবারই জয়কে দিচ্ছ। এখন তো চাকরি করে।

ও চাকরিতে কী হয়! এনো। সংসারে যখন থাকি না তখন তার কমপেনসেশনও কিছু দিতে হয়।

সংসারের সঙ্গে আজকাল কেউ থাকে না। ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখো।

ও শর্মিষ্ঠা!

টাকা দাও।

কত লাগবে?

হাজার খানেক দিয়ে রাখো।

বুবুমকে ঘুম পাড়িয়ে যাও। বলে চোরা পকেট থেকে টাকা বের করে বৈশম্পায়ন।

শর্মিষ্ঠা ব্যাগে টাকা রেখে ছেলের কাছে যেতে গিয়ে ফিরে বলে, চা খাবে?

ওরা ফিরুক।

ওদের সঙ্গে তোমার কী? ঝি করে দেবে।

তা হলে করতে বলল।

শর্মিষ্ঠা চলে গেলে বৈশম্পায়ন চোখ বোজে। সাদা হিম নুড়ি-পাথর ছড়ানো উপত্যকায় বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর নদী। কী অদ্ভুত গান।

শর্মিষ্ঠা চলে যাওয়ার পর বেডরুমের পাশের লিভিং রুমে ফোনটা বাজল।

উঠে গিয়ে ধরে বৈশম্পায়ন।

মাধব আছে?

না।

আপনি কে?

আমি ওর এক বন্ধু!

আমি মাধবের বন্ধু। আপনি কে বলুন তো। নামটা কী?

আমি বৈশম্পায়ন।

যাঃ বাব্বা! না মশাই হল না, আমরা কমন ফ্রেন্ড নই।

এরকম হতেই পারে। বৈশম্পায়ন খুব ভদ্র গলায় বলে।

ওর সঙ্গে কি আপনার দেখা হবে?

হতে পারে। আমি ওর জন্যই বসে আছি।

একটু কাইভলি বলবেন কাল সকালে ওর বন্ধু মদন আসছে! ও চিনবে। মদন এম পি।

মদনকে আমিও চিনি।

যা বাব্বা! তবু আমি আপনাকে চিনতে পারছি না কেন?

ফোনের ভিতর দিয়েই ওপাশ থেকে একটু মদের গন্ধ পায় বৈশম্পায়ন।

.

০২.

শিয়ালদা মেন স্টেশনের ছ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গেটের বাইরে ফরসা মতো একটা লোক খুব মাতব্বরি চালে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছিল। টিকিট নেওয়ার কালো কোট দুজন থাকা সত্ত্বেও ভিড়ের ঠেলায় যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে বেনোজলের মতো, কে কাকে টিকিট দেয়। এই লোকটা সেই ছিটকে আসা যাত্রীদের দু চারজনের দিকে হাত বাড়িয়ে টুকটাক টিকিট নিয়ে পকেটে ভরছে।

দার্জিলিং মেল লেটে আসছে। অনেকক্ষণ বাইরের চাতালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করল জয়। তার প্রথমে তেমন কিছু মনে হয়নি। ভেবেছিল কালো কোট খুলে রেলের টিকিটবাবুই টিকিট নিচ্ছে। খানিকক্ষণ দেখে-টেখে সন্দেহ হল, করাপশন।

জয়ের বড় জামাইবাবু বলেছিলেন, অন্যায় দেখলেই ফরম্যালি হলেও একটা প্রতিবাদ সবসময়ই করে রেখো। কাজ হোক বা না হোক বড় জামাইবাবু সর্বদাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে থাকেন। তাতে যে বড় জামাইবাবুর খুব ভাল হয়েছে তা নয়। বরং প্রোমোশন হয়নি, মেয়েরা যে যার ইচ্ছে মতো বিয়ে করেছে, তিন ছেলেই আগাপাশতলা দুর্নীতিগ্রস্ত, বড়দির সঙ্গেও বড় জামাইবাবুর বনিবনা। নেই। তবু জয় বড় জামাইবাবুর এই একটা কথা মেনে চলার চেষ্টা করে।

দু দুটো লোকাল ট্রেনের পর প্ল্যাটফর্ম এখন ফাঁকা। করাপটেড লোকটা সাত নম্বরের বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করছে।

ও মশাই শুনুন। জয় লোকটাকে ডাকে।

লোকটা নিমীলিত চোখে চায়। চোখ দুখানা বড় বড়, ডাগর, মুখও ভদ্রলোকের মতো, রং ফরসা তবে গায়ের জামাপ্যান্ট ময়লা। লোকটা ঠোঁট থেকে একটা মাছিকে উড়িয়ে বলল, কিছু বলছেন?

আপনি কি টিকিট কালেক্টর?

আজ্ঞে না।

তবে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছেন যে!

লোকটা একথায় সুড়ুক করে কাছে সরে আসে, তখুনি এই সাত সকালেও লোকটার মুখ থেকে ভক করে মদের গন্ধ পায় জয়। লোকটা গলাটা ছোট করে বলে, চুরি ছিনতাই করি না। টিকিটে চার আনা করে হয়। খারাপ কিছু করছি দাদা? মনে কিছু করলেন?

জয় কঠিন হওয়ার চেষ্টা করেও পারে না। সে ভারতবর্ষের একটি বড় পার্টির দক্ষিণ কলকাতার একজন মেম্বার। সে দুর্নীতি রুখতে অনেক কিছুই করতে পারে বলে তার ধারণা। যদিও এই রাজ্যে তার দলের কোমরের জোর তেমন নেই, তবু তামাম দেশে তো তার দলই এখন খেলছে। এই লোকটাকে ইচ্ছে করলেই সে ধরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একটু মায়া হল। বয়সও বেশি নয়। ত্রিশের নীচেই।

জয় বলল, মদ খেয়েছেন?

একটু। সেও কাল রাতে। কিছু মনে করলেন দাদা?

আপনি কাজটা ঠিক করছেন না।

আজ্ঞে না। তবে কিনা পেটের দায়ে করতে হয়। কত লোকে আরও কত খারাপ কাজ করে। চারদিকে করাপশন অ্যান্ড করাপশন।

চার নম্বরে আর একটা লোকাল ঢুকতেই লোকটা সুট করে গেটের বাইরে গিয়ে গোলকিপারের মতো পজিশন নিয়ে নিল।

লোকটাকে ধরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা জয় দমন করল। করাপশন কোথায় নয়? এই যে প্ল্যাটফর্মে ছানাপোনা নিয়ে কুঁদো কুঁদো সব মেয়েছেলে শুয়ে থাকে রাত্রিবেলা সেটাও বে-আইনি। আবার সকালে চাতাল ধোয়ার সময় ভিস্তিওলা যখন ওই ঘুমন্ত মেয়ে আর শিশুর গায়ে নির্বিকারে জল ছিটিয়ে উঠিয়ে দিতে লাগল তখন সেটাকেও খুব ন্যায় মনে হয়নি তার। মুশকিল হল, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তার কোনও বাঁধাবাঁধি ধারণা সে আজও করে উঠতে পারেনি। গোটা দেশটায় কী যে সব ঘটছে।

দলের কিছু ছেলে-ছোকরা মদনদাকে রিসিভ করতে এসেছে। তাদের সঙ্গে জয় ভেড়েনি। মদনদার সঙ্গে তো তার ভিড়ের সম্পর্ক নয়। বহুকাল আগে হালতু থেকে পালবাজার অবধি মদনদা তাকে সাইকেলের রডে বসিয়ে ডবল ক্যারি করেছিল। আর, তার সেজদির সঙ্গে মদনদার একটা সম্পর্ক তো ছিলই। সুতরাং জয়ের দাবি অন্যরকম। এম পি হয়েও মদনদা তার সঙ্গে ফাঁট দেখায় না কখনও। অবশ্য মদনদার ফাঁট বলতেও কিছু নেই।

লাউডস্পিকারে বার বার বলছে, ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকার দরুন দার্জিলিং মেল আসতে পারছে না। সোয়া সাতটায় আসার কথা, এখন বাজছে নটা। দাঁড়িয়ে আর পায়চারি করে করে জয়ের হাঁটু দুটো ধরে গেছে। বাড়ি থেকে বেরোতে দেরি হল বলে কিছু খেয়েও আসেনি। স্টেশনের খচ্চরের পেচ্ছাপের চেয়েও খারাপ এক কাপ চা খেয়েছে ত্রিশ পয়সায়। তার মধ্যে পনেরো পয়সাই ফেলা গেছে। ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক বা খচ্চরের ইয়ের মতো চা, এই সবকিছুর মধ্যেই এই দেশটার পচনশীলতা লক্ষ করা যায়।

কিছুই ঠিকমতো চলছে না, কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না। একজন এম পি সহ দার্জিলিং মেল আটকে আছে ডানকুনিতে, ভাবা যায়?

টেকো হরি গোঁসাই এতক্ষণ প্ল্যাটফর্মে টানা মারছিল। অধৈর্য হয়ে এবার বেরিয়ে এসে জয়কে বলল, গাড়ি এত লেট! এরপর তো আমার অফিস কামাই হয়ে যাবে!

জয়ের মেজাজ খারাপ ছিল। একটু তেরিয়া হয়ে বলল, দেরির কথা রাখো। বারোটার আগে কোনও দিন দফতরে গেছ?

হরি গোঁসাইকে রসিক মানুষ বলে সবাই জানে। ফিচেল হেসে বলে, তা বারোটার সময়েও তো যেতে হবে নাকি? এখানেই নটা বাজল।

দেরি হয়ে থাকলে চলে যাও।

সে না হয় গেলাম। কিন্তু তা হলে বিশুকে মেডিকেলে ভর্তি করার কী হবে?

করাপশন! করাপশন! মদনদাকে এই লোকগুলোই খারাপ করে ফেলবে। ভারী বিরক্ত হয় জয়। স্টেশনে যে কটা লোক এসেছে সব কটা ফেরেব্বাজ, মতলববাজ। মুখে জয় বিরক্তির রেশটা ধরে রেখেই বলল, ও কথা তো মদনদা মালদায় যাওয়ার আগেই হয়ে গেছে।

দূর পাগল! এম পিদের মন হচ্ছে পদ্মপাতার মত। কিছু থাকে না, গড়িয়ে পড়ে যায়। বার বার মনে করিয়ে দিতে হয়।

ফের বললে চটে যাবে।

চটলেও ভাল। তাতে মনে দাগ থেকে যাবে। চ চা খেয়ে আসি। ডানকুনি থেকে গাড়ি ছাড়লে চল্লিশ মিনিট লাগবে। সময় আছে।

স্টেশনের চা? ও বাব্বা!

না, বাইরে থেকে খাব। চল, হ্যারিসন রোডে ঢুকে একটা ভাল দোকান আছে।

লাউডস্পিকারে গমগমে গলা বলে উঠল, ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকার দরুন..

দুজনে বেরিয়ে আসে।

হরিদা!

উ।

একটু আগে একটা লোককে ধরেছিলাম। প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছে। চার আনায় বেচবে। সারাদিন একটাই টিকিট কতবার যে হাতবদল হবে।

ও তো বহু পুরনো ব্যাপার।

লোকটাকে পুলিশে দিলে কেমন হত?

তোর মাথা খারাপ? ওদের সব সাঁট আছে। ধরিয়ে যদিও বা দিলি গ্যাং এসে মেরে পাট করে দিয়ে যাবে। যা কিছু হচ্ছে হোক, চোখ বুজে থাকবি।

জয় কথাটা মেনে নিতে পারে না। বলে, এরকম করে করেই তো আমরা দেশটার

সর্বনাশ করছি। জয়ের কথাটা টেনে শেষ করে হরি গোঁসাই হাসে, উঠতি বয়সে ওরকম হয়।

বৃষ্টির জলে রাস্তায় থিকথিকে কাদা। তার ওপর খোঁড়াখুঁড়ির দরুন হাঁটা-চলাই দায়। হ্যারিসন রোডের চায়ের দোকানটায় পৌঁছতে গর্দিশ কিছু কম গেল না।

দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। মিনিট পাঁচ সাত দাঁড়িয়ে থেকে যদি বা বসার জায়গা পেল অতি কষ্টে, কিন্তু চা-ওয়ালা ছোকরারা পাত্তাই দেয় না। হরি গোঁসাই দুজনকে চায়ের কথা বলতে গেল, তারা অর্ধেক শুনেই অন্য কাজে ছুটে চলে গেল।

কিছু লোক আছে বুঝলে হরিদা, যাদের দেখলেই সবাই খাতির করতে থাকে। মদনদার কথাই ধরো, গঁড়ে বাজারে যেবার সত্যবাবুকে বাইরের দোকানিরা পেটাল, মদনা গিয়ে দাঁড়াতেই সব জল।

পারসোনালিটি, বুঝলি!

সেই কথাই তো বলছি। আমরা রেশন অফিসে গেলে কেউ পাত্তা দেবে, বলো? মদনদাকে দেখেছি, খুব কড়াকড়ি তখন, গিয়ে দু দিনে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অফিস থেকে মেজদাদের রেশন কার্ড বের করে দিল। আগে থেকে কেউ চেনাজানাও ছিল না, কিন্তু গিয়ে এমন খাতির করে নিল যে, সবাই কিছু করতে পারলে যেন বর্তে যায়।

ও হল অন্য ধাত। বিশুটাকে মেডিকেলে ভর্তি করাতে যদি কেউ পারে তো মদনদা।

এবার কেন যে খুব উদার গলায় জয় বলে, হয়ে যাবে। ভেবো না। তবে কথাটা ঠিক, আজকাল মদনদা খুব ভুলে যায়।

এম পি-দের ঠেলা তো জানিস না। সকাল থেকে মাছি পড়ে। কটা মনে রাখবে?

জয় দূরের দিকে চেয়ে ভারী ভালবাসার গলায় বলল, কিন্তু আগে মদনদার সব মনে থাকত। এমন সব কথা মনে থাকত যা ভাবলে অবাক হতে হয়।

হরি গোঁসাই খপ করে এক চা-ওলা ছোকরার কব্জি চেপে ধরে বলল, আমাদের যে গাড়ির তাড়া, দু কাপ চা টপ করে দেবে ভাই?

তাড়া তো সবার। ছোকরা হেসে বলে, শুধু চা?

শুধু চা। একটু দুধ চিনি বেশি করে।

তা অত কথা শোনার সময় ছোকরার নেই, হাত ছাড়িয়ে চলে গেল।

জয় বলে, নীলু হাজরার খুনের কেসটা মনে আছে? মদনদা সাক্ষী দিয়েছিল। খুনের সময় নীলুর জামার রংটা পর্যন্ত হুবহু বলে দিয়েছিল। মদনদার সাক্ষীতেই তো নব হাটির চৌদ্দ বছর মেয়াদ হল।

মুখটা চোখা করে হরি গোঁসাই বলে, খুনটা কিন্তু নব করেনি।

তবে কে করেছে? তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ঝুঁকে বসল জয়।

হরি গোঁসাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভাল মানুষের মতো বলে, সে-সব কথা যাকগে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। তারপর আরও এক পা গলাটা নামিয়ে নিজেকেই নিজে যেন বলল, এখন বিশুটা মেডিকেলে চান্স পেলেই হয়।

চা এসে যায়। বেশ ভাল চা।

নোনতা বিস্কুট খাবি? হরি গোঁসাই জিজ্ঞেস করে।

আনমনে চায়ে চুমুক দিয়ে জয় বলে, না। তুমি খাও।

দার্জিলিং মেল আট নম্বরে ঢুকল ঠিক পৌনে দশটায়। এর মধ্যে আরও কিছু লোক জুটে গেছে মদনদাকে রিসিভ করতে। জনা দুই রিপোর্টার, দু-চারজন মহাজন, আরও কিছু ছেলেছোকরা ক্যাডার।

শুধু একটা মাঝারি মাপের ভি আই পি স্যুটকেস হাতে, পায়জামা পাঞ্জাবি পরা মদনদা ফার্স্ট ক্লাশ একটা কামরার দরজাতেই বিরক্তমুখে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন থামতেই নেমে পড়ল। ভিড়ের প্রথম হুড়োহুড়িটা কাটানোর জন্য একটু সরে দাঁড়াল। লোকগুলো গিয়ে মাছির মতো হেঁকে ধরেছে মদনদাকে। কে যেন একটা মালা পর্যন্ত পরিয়ে দিল।

দিক। ওসব বাইরের মাখামাখিই তো আর আসল নয়। মদনদার সঙ্গে সত্যিকারে ঘনিষ্ঠতা তো জয়ের। এক সাইকেলে তাকে ডবল ক্যারি করেছিল মদনদা। তারই সেজদির সঙ্গে ভাব ছিল। আর কারও সঙ্গে তো অত গভীর সম্পর্ক নয়। মদনদার বয়স পঁয়ত্রিশ হবে হয়তো টেনেমেনে। এখনও বেশ টান ফরসা টনটনে চেহারা। দেখলেই সম্ভ্রম জাগে।

ট্রেন লেট ছিল বলে ব্যস্ত এম পি মানুষটার সময়ে টান পড়েছে। ভিড় কাটিয়ে জোর কদমে এগুচ্ছে। ওই হরি গোঁসাইয়ের ছেলেটা দড়াম করে পায়ের ওপর পড়ে প্রণাম ঠুকল! দেখো কাণ্ড! আর একটু হলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যেত লোকটা।

কিন্তু মদনদা পড়ল না। মদনদারা পড়ে না অত সহজে। এমনকী অসন্তুষ্টও হল না। লোক নিয়ে কারবার, লোকের ওপর বিরক্ত হলে চলবে কেন।

জয় দেখল, সে পিছনে পড়ে থাকছে। মদনদা তাকে দেখতে পায়নি! গা ঘষাঘষি সে পছন্দ করে না বটে, কিন্তু জানান দেওয়ার জন্য একবার বেশ জোর গলায় ডাকল, মদনদা!

মদনা পিছু ফিরে দেখে একটু হাসল।

দেখেছে! যাক, নিশ্চিন্তি। জয়ের সকালটা সার্থক।

.

০৩.

খবরের কাগজ নিয়ে পায়খানায় যাওয়াটা মোটেই ভাল চোখে দেখে না মণীশ। কিন্তু সংকোচবশে শালা মদনকে কথাটা বলতেও পারে না। মণীশরা চিরকাল এঁটোকাঁটা, শুদ্ধাচার, বাথরুমে যাওয়ার অবশ্য পালনীয় নিয়ম কানুন মেনে এসেছে। তার বাসার সবাই মানে।

খবরের কাগজটার জন্য অস্বস্তি বোধ করছিল মণীশ। সকালের দিকে অফিসের তাড়ায় ভাল করে পড়া হয় না, তাই বিকেলে এসে পড়ে। আজ আর খবরের কাগজটা পড়া যাবে না। এম পি শালাকে কিছু বলাও যায় না।

মণীশ খেতে বসেছে। একটু দেরিতেই অফিসে যাচ্ছে আজ। ডালের মুখে একটু আলু ভেজে দেবে বলে চিরু তাকে আস্তে খেতে বলেছে। আস্তেই খাচ্ছে সে, কিন্তু ভাজাটা সময়মতো পাবে বলে মনে হচ্ছে না। মদনকে যারা স্টেশনে রিসিভ করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে আট-দশজন সঙ্গেই এসেছে। বাইরের ঘরে জোর গলা পাওয়া যাচ্ছে। চা না দেওয়াটা অভদ্রতা, তার ওপর এরা কেউই খুব এলেবেলে লোক নয়। চিরু এখন আলুভাজার কড়াই নামিয়ে চায়ের জল বসিয়েছে। সময় লাগবে।

আস্তে আস্তে খেয়েও মণীশের পাতের ডালভাত শেষ হয়ে এল। রান্নাঘর আর বাথরুমের মাঝামাঝি ছোট্ট এক চিলতে একটু ঢাকা জায়গায় অতিকষ্টে তিন ফুট একটা টেবিল আর দুটি চেয়ার পেতে তাদের খাওয়ার জায়গা। ডানদিকে একটা জানালা। জানালার পাশে গলি। সেদিক থেকে সূর্যালোকহীন স্যাঁতস্যাঁতে গলির সোঁদা গন্ধ আসে। জানালা দিয়ে সিনারি বলতে দেখা যায় শুধু পাশের বাড়ির দেয়াল এবং রেন পাইপ। ইদানীং রেইন পাইপ ঘেঁষে একটা অশ্বত্থের চারা বেরিয়েছে। ভারী সবুজ, ভারী সতেজ। রোজ ওই সবুজটুকুর দিকে চেয়ে ভাত খায় মণীশ। আজ দেখছিল বড় বড় তিনটে পাতার আড়ালে আর একটা কচি পাতা উঠেছে।

আর একটু বোসো, হয়ে এল। চিরু শোয়ার ঘরে তোলা কাপ প্লেট আনতে যাওয়ার পথে বলে গেল।

মণীশ শেষ গ্রাসটার দিকে চেয়ে রইল। চিরু আবার ভাত দেবে জোর করে, কিন্তু আজ আর তার খেতে ইচ্ছে করছে না।

কাপ প্লেটের পাঁজা নিয়ে চিরু যখন ফের রান্নাঘরে ঢুকছে তখন মণীশ বলল, শোনো, আমার পেট ভরে গেছে। দেরিও হয়ে যাচ্ছে।

সামনের জিনিসটা না খেয়ে চলে যাবে? বোসো না। হয়ে গেছে তো।

কেন ঝামেলায় জড়াচ্ছ? থাক না, রাতেও তো খেতে পারব। শু

শুধু তো ডাল ভাত খেলে!

হোক না, ডালে ঝিঙে আর লাউ দিয়েছিলে যে। শুধু ডাল ভাতের দোষ কেটে গেছে।

এ কথায় চিরু একটু হাসল। রুক্ষ চুল, না-সাজা চেহারায় চিরুকে এই ক্লান্তিতে ভরা হাসি দিয়ে চেনা যায়। কুড়ি বছর ধরে মণীশের সব দুঃখের ভার বহন করছে। এই দু-ঘরের বাসার বাইরের পৃথিবীকে খুব একটা দেখেনি। ভাই এম পি হওয়ার পর একবার দিন দশেকের জন্য ছেলেমেয়ে নিয়ে দিল্লি গিয়েছিল। ব্যস।

রান্নাঘরে কাপ প্লেট ধুতে ধুতে চিরু বলে, বাসন্তীকে কখন বিস্কুট আনতে পাঠিয়েছি এখনও এল না।

আসবে। বলে শেষ গ্রাসটা মুখে দিয়ে মণীশ জল খেল।

আসবে তো। চা যে ঠাণ্ডা হবে ততক্ষণে। সরকারদের বাড়ির থেকে নাকি ভাঙানি দিচ্ছে। আজকাল কাজে একদম মন নেই। চলে গেলে কী যে করব। চিরুর গলায় অসহায়তা ফোটে বটে, কিন্তু রাগ বা বিদ্বেষ নেই।

বাসন্তী গেলেও তোক পাওয়া যাবে।

চিরু চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলে, এ চা-পাতাটার কত দাম গো?

মদন আসবে বলে কাল একটু ভাল চা এনেছে মণীশ। বলল, ত্রিশ টাকা।

ভীষণ দাম।

পাঁচ বছর আগেও এই কোয়ালিটির চা ষোলো টাকায় কিনেছি।

দাম নিলেও গন্ধটা বেশ।

লোকজনের সামনে বাইরের ঘর দিয়ে খাবার আনাটা অভদ্রতা বলে চিরু বাসন্তীকে শিখিয়েছে, গলির জানালা দিয়ে খাবারের ঠোঙা গলিয়ে দিতে। মণীশ জলের গ্লাস রেখে যখন উঠতে যাচ্ছে তখন জানালা দিয়ে ঠোঙাসুদ্ধ কচি হাত ঢোকাল বাসন্তী।

মামাবাবু, ধরো।

মণীশ বাঁ হাতে বিস্কুটের ঠোঙাটা নেয়। বলে, এসে গেছে।

চিরু বলে, আজ কি ফিরতে দেরি হবে?

না। রোজ যেমন ফিরি। কেন?

ভাবছিলাম, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে একবার দমদমে কণাকে গিয়ে খবর দিয়ে আসতে পারবে কিনা।

কেন বলো তো! হঠাৎ কণাকে কেন?

মদনকে ওর সব কথা এসে বলুক। যদি মদন কিছু করতে পারে।

একজন এম পি কী কী পারে তা খুব ভাল করে জানা নেই মণীশের। তবে হয়তো অনেক কিছুই পারে। হুট করে কিছু না বলে সে একটু ভাবল, ভেবে বলল, এ তো অত্যন্ত পারসোনাল প্রবলেম চিরু। মদন কী করবে?

আর কিছু না পারুক, সুভাষকে ভয় দেখাতে তো পারবে। কণা গত রবিবারে এসেও কত কান্নাকাটি করে গেল। বোম্বেতে বদলি হয়ে সেই যে চার মাস আগে গেছে সুভাষ, এখনও

একবারটিও আসেনি। মাত্র তিনখানা চিঠি দিয়েছে। টাকা পাঠাচ্ছে খুব সামান্য। তার মানে তো বুঝতেই পারছ। ওখানে আবার কোনও মেয়েকে জুটিয়ে নিয়ে ফুর্তি করছে।

মণীশ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে, সুভাষ চিকিৎসার বাইরে। কারও কারও রক্তই ওরকম খারাপ। মদন ইন্টারফিয়ার করলে যদি আরও ক্ষেপে ওঠে তবে কণার ওপর টচার করবে।

টর্চার কি এখনই কম করছে? কণার জন্য আমাদের কিছু করাও তো দরকার। মদনকে বলি, তারপর ও যা ভাল বুঝবে, করবে।

ঠিক আছে।

তা হলে যাবে?

যাব।

গিয়ে বেশি দেরি কোরো না।

দমদম থেকে এই মনোহরপুকুর আসতে একটু সময় তো লাগবেই। চিন্তা কোরো না।

বাথরুম থেকে মদনের কাশির শব্দ আসছে। সঙ্গে জলের শব্দ। এবার বেরোবে। কিন্তু আজকের খবরের কাগজটা আর ভাল করে পড়া হবে না মণীশের।

মণীশ যখন পোশাক পরছে তখন মদন এসে ঘরে ঢুকল। কাঁধে তোয়ালে। হাতে জলের ছোপ লাগা খবরের কাগজ। পায়খানার কাপড়ও ছাড়েনি বোধহয়। ব্যস্ত এম পি, এসব ছোটখাটো ব্যাপারে নষ্ট করার মতো সময় নেই।

জামাইবাবু কি অফিসে বেরোচ্ছেন?

আর কী করি বলো?

আমার অনারে আজ অফিসটা কামাই দিতে পারতেন।

কামাই দিলেও লাভ নেই। তোমাকে পাব কোথায়? এক্ষুনি বাইরের ঘরের ভক্তরা তোমাকে দখল করে নেবে। তারপর প্রেস কনফারেনস আছে, রাইটস আছে, আরও কত কী!

মদনের চেহারাটা ভালই। লম্বা, একহারা, ফরসার দিকেই রং। মুখশ্রীতে একটু বেপরোয়াভাব আছে। একটু চাপা নিষ্ঠুরতাও। মদনের ভয়ডয় বরাবরই কম। কোনও ব্যাপারেই লজ্জা সংকোচের বাই নেই। অবিশ্রাম কাজ করে যেতে পারে, সহজে ক্লান্ত হয় না। কাজ করতে করতে এযাব, বিয়ে করে উঠতে পারেনি। গায়ে একটা গুরু পাঞ্জাবি চড়াতে চড়াতে বলল, বাইরে হালদারের গাড়ি আছে। বলে দিচ্ছি, আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

প্রস্তাবটি লোভনীয়। এখন এই দেরিতে বেরিয়েও বাসে উঠতে দারুণ কষ্ট হবে মণীশের। তবু সে মাথা নেড়ে বলে, ওবলিগেশনে যাবে কেন? আমাকে তো রোজই অফিসে যেতে হবে। রোজ তো হালদারের গাড়ি পাব না। তা ছাড়া অফিসের লোক গাড়ি দেখলে বলবে, এম পি শালার খুঁটির জোরে গাড়ি দাবড়াচ্ছি।

আপনাকে আর মানুষ করা গেল না।

চিরু চায়ের ট্রে হাতেই ঘরে ঢুকে বলে, মদন, তুই এখন কিছু খাবি না?

মদন ভ্রূ কুঁচকে বলে, বাইরের ঘরে চা দিচ্ছিস নাকি?

চিরু লজ্জা পেয়ে বলে, দিই একটু।

ডিসগাস্টিং। সারাদিন লোক এলে সারাদিনই চা দিবি নাকি? ওসব ভদ্রতা খবরদার করতে যাবি না। ওদের দরকারেই ওরা আসে, আতিথেয়তার কিছু নেই।

তুই চুপ কর তো। আমার মোটেই কষ্ট হয়নি।

কষ্টের কথা নয়। ফতুর হয়ে যাবি

তোকে এখন খাবার দেব তো!

না, একটু বাদে ভাত খেয়ে বেরোব।

চিরু চলে যেতে মদন চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বলে, খাঁদ বঁচি সব কই?

ইস্কুলে। মণীশ বলে, সারা সকাল তোমার জন্য হাঁ করে পথ চেয়েছিল। ট্রেন লেট বলে আর থাকতে পারল না।

ডানকুনিতে পাওয়ার ব্লক থাকায় আটকে গেল গাড়ি। সকালে একটা ইমপরট্যান্ট এনগেজমেন্ট ছিল, রাখা গেল না।

মদন চারদিকে চেয়ে বলে, এ ঘরটায় কী করে যে এতকাল আছেন আপনারা। একে একতলা, তাতে ছোট ঘরে গাদা জিনিসপত্র। এতদিনে একটা বাড়ি করার মতো টাকা আপনার হয়েছে জামাইবাবু।

সতীনের ছেলেকে সবাই মোটা দেখে। টাকা হত, যদি রাখা যেত।

মদন মাথা নেড়ে বলে, আপনার কিছু হবে না জামাইবাবু।

যা বলেছ।

তবু আপনি ভীষণ হ্যাপি।

আবার সেই সতীনপো-এর বৃত্তান্ত! পরের সুখই সকলের চোখে পড়ে।

চুল আঁচড়ে মদন ঘাড়ে গলায় একটু পাউডার দিল। বলল, আর কিছু না করুন, এবার একটা টেলিফোন লাগান। নইলে আমার ভারী অসুবিধে।

ঠিক আছে, অ্যাপ্লাই করব।

আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করবখন।

.

০৪.

ভুলে যাওয়ার এক অতুলনীয় ক্ষমতা আছে মদনের। আবার মনে রাখার ক্ষমতাও তার তুলনারহিত। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশে সে জীবনের ফালতু ঘটনা, মানুষ বা কথাকে ভুলে যেতে পারে। যা তার প্রয়োজন তা প্রখরভাবে মনে রাখে।

ফিটফাট হয়ে যখন সে বাইরের ঘরে ঢুকল তখন সকালের অনেক ঘটনাই ভুলে গেছে। আবার বেশ কিছু ঘটনা তার মনেও আছে।

মনে রাখার মধ্যে আছে দুজন সাংবাদিক। আগাগোড়া দুই রিপোর্টার তার সঙ্গে লেগে আছে।

ঘরে ঢুকেই সে বলল, শচী, বলো খবর কী?

শচী লম্বা কালো মোগা এবং ধূর্ত। চারদিকে মিটমিটে চোখে চেয়ে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলে, খবর তো আপনার কাছে দাদা।

ঘরের কথাবার্তা থেমে গেছে। সকলে এম পির দিকে তাকিয়ে। প্রাইম মিনিস্টার পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

মদন চারদিকের মনোযোগটাকে খুব উপভোগ করে। দরজার কাছে রোগা ও অল্পবয়সী জয় তার চা এখনও শেষ করতে পারেনি। এবার এক চুমুকে শেৰ আধপেয়ালা মেরে দিল।

মদন বলল, গত জুলাইয়ে মনসুন সেশনে আমি পালামেন্টে একটা বিলের ওপর খুব গুরুতর একটা প্রশ্ন তুলি। দিল্লি, এলাহাবাদ, বোম্বের কাগজে সেটা ফাস্ট পেজে ফ্ল্যাশ করে। তোমাদের কাগজে তার সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। কেন শচী! বাঙালি এম পি বলেই কি তোমাদের এরকম মনোভাব?

শচী জিব কেটে বলে, ছি ছি। কে না জানে, আমরা বাঙালি লিভারদের সবচেয়ে বেশি কভারেজ দিই।

আমাকে দাওনি। কভারেজ আমি চাইও না। দি ইসু ওয়াজ ইমপরট্যান্ট। সেটা অন্তত কভার করা উচিত।ছল।

এজেন্সি আমাদের খবর দেয়নি তা হলে।

নিশ্চয়ই দিয়েছিল। পি টি আই, ইউ এন আই সকলে কভার করেছে। দেয়নি আমাদের দিল্লির করেসপন্ডেন্ট। আই হেট হিজ গাটস। তবে সনাতন মুখার্জিকে আমি চিনি। ওয়ান ডে উই উইল হ্যাভ এ শো-ডাউন।

সনাতনদার হয়তো দোষ নেই! খবরটা নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন, নিউজ ডেসকে বাদ হয়ে গেছে।

তাই বা কেন হবে? নিউজ ডেসক কি ঘাস খায়? খবরের ইমপরট্যান্স বোঝে না?

আমি জেনে আপনাকে বলব মদনদা।

মদন দেখেছে, কনফ্রনটেশন দিয়ে দিন শুরু করলে তার দিনটা ভালই যায়। এইজন্য সে সকালের দিকে একটা ঝগড়া বা চেঁচামেচি বাঁধিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আজ শচীকে ধমকে তার বউনি বোধহয় ভালই হল।

ভোটের সময় মদনের পক্ষে পাণ্ডা ছিল শ্রীমন্ত। এতক্ষণ বাইরের রাস্তায় সিগারেট খাচ্ছিল দু-তিনজনে মিলে। মদন বাইরের ঘরে এসেছে টের পেয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে একধারে একটা গদিআঁটা বড় সোফা, দুটো ছোট সোফা, কয়েকটা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের পলিথিনের চেয়ার। সবটাতেই ঠাসাঠাসি ভিড়।

শ্রীমন্ত এসে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে কানে কানে বলে, হালদারের সঙ্গে একটু কথা বলে যাবেন। সবার হয়ে গেলে। প্রাইভেট।

শ্রীমন্তের কথা মানতেই হয় মদনকে। শ্রীমন্ত তার ডান হাত। মদন নিচু গলায় বলে, ফালতু লোক কিছু কাটিয়ে দে।

হরিদা তার ছেলেকে মেডিকেলে ভর্তি করানোর কথা বলতে এসেছে। কাল আসতে বলে দিই?

দে।

আর জয়?

ও কী চায়?

কিছু বলেনি। তবে কিছু চায় নিশ্চয়ই।

কাটিয়ে দে।

তা হলে ওদের নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। দুপুরে কি প্রেস ক্লাবে আসতে হবে?

আসিস।

শ্রীমন্ত ওঠে। পেটানো বিশাল চওড়া তার শরীর। একবার তাকালেই তার পেশা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। সে গিয়ে দরজার ভিড়টাকে প্রায় কোলে নিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

একটা চেনামুখের দিকে চেয়ে মদন হাসে, কী খবর?

আধবুড়ো সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোকটি কিছু তটস্থ হয়ে বলেন, রেল বোর্ডে আমার কেসটার কথা তুলবেন বলেছিলেন।

কাগজপত্র কিছু দিয়েছিলেন আমাকে?

দিয়েছিলাম। গত জানুয়ারিতে।

ওঃ, তা হলে হারিয়ে ফেলেছি। মাঝখানে ফিলিপিনস মালয়েশিয়া সব যেতে হয়েছিল ডেলিগেশনে। ফিরে এসে দেখি, ফাইলে অনেক কাগজপত্র নেই।

তা হলে?

একটা চিঠি করে দিয়ে দেবেন আমার কাছে। দেখব।

কথাটা ভাল করে শেষ করার আগেই বাঁ ধারের বুক কেসের কাছে দাঁড়ানো এক মহিলা বললেন, বাবা, আমার কথাটা একটু শুনে নেবে? বাড়িতে ছোট বাচ্চা রেখে এসেছি। দূরও অনেক, সেই বোড়াল।

বলুন।

আমি মন্টু হাটির মা।

ও। মন্টু কে যেন?

আমার ছেলে। ওই বড়। মেজো নব।

নব?

নীলু হাজরার খুনের দায়ে যে ছেলে জেল খাটছে।

মদন একটু নড়ে বসে, ও, তা কী চাই আপনার? নবর জন্য তো আর কিছু করার নেই।

তার বউ বাচ্চা সব আমার ঘাড়ে। মন্টু এক পয়সাও দেয় না। নব জেলে। আমি কী করে সলাই?

আর্নিং মেম্বার কেউ নেই?

না। নবর বউ একটা সেলাই স্কুলে কাজ করে। কিছু পায়। তাতে হয় না।

আমাকে কী করতে বলেন?

নবর অফিসে যদি ওর বউয়ের একটা চাকরি হয়।

কোন অফিস?

বেহালায়। সি সি পি কারখানা। বউ অনেক ধরাধরি করেছে, হয়নি।

কী বলে ওরা?

খুনের বউকে চাকরিতে নেবে না।

সি সি পি না কী বললেন?

সি সি পিই হবে বোধহয়। তাই তো শুনি।

আচ্ছা, বাইরে শ্রীমন্ত আছে। ওকে ডেকে ডায়েরিতে নামটা লিখিয়ে যান। দেখব।

দেখো বাবা।

একটা কথা বলব মাসিমা? নীলু হাজরা ছিল আমার এক বন্ধুর ছোট ভাই। আমরা সবাই ভালবাসতাম তাকে। ভারী ভাল ছেলে ছিল।

নব ঘটির বিধবা মায়ের চেহারাটা খুব নিরীহ ব্রনের নয়। বয়স হলেও ডাকসাইটে স্বভাবের ছাপ আছে। কথাবার্তায় কোনও জড়তা নেই, ভয়ডর নেই। যে কোনও জায়গা থেকে কাজ আদায় করে আনার ক্ষমতা রাখে কিন্তু মদনের এই শেষ কথাটায় বুড়ি একটু কেমনধারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সন্দিহান চোখে মদনের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তা হলে কি ওর বউয়ের জন্য একটু বলবে না বাবা?

মদন হাসল, খুন তো করেছে নব, ওর বউ তো নয়। বলব। তবে আমি দিল্লি হলে যতটা পারতাম এখানে ততটা তো পারি না। তবু বলে দেখব। কারখানার মালিক কে জানেন?

কানোয়ার না কী যেন।

এই যে লম্বা চওড়া ছেলেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওই শ্রীমন্ত। রাস্তায় আছে, একটু খুঁজে নিয়ে তার কাছে সব লিখিয়ে দিয়ে যান। আপনার বউমার নামও।

আচ্ছা।

প্রেস ক্লাব থেকে দুপুরে একটা ফোন করল মদন।

মাধব?

আরে মদনা? কোত্থেকে?

মালদার ইনটিরিয়ারে বান দেখতে গিয়েছিলাম।

দেখলি?

দেখলাম। মেলা জল।

ফি বছরই অক্রুর সংবাদ। এখানে জল, সেখানে জল, মরছে ভাসছে গৃহহারা হচ্ছে। তোরা করছিস কী?

দিল্লিতে বসে মোচ তাওড়াচ্ছি। কী করার আছে? ভেসে যাক, সব ভেসে যাক।

দে ভাসিয়ে তবে শালা, দে ভাসিয়ে। কোথায় উঠেছিস?

আবার কোথায় উঠব। মনোহরপুকুর।

দিদির হাত ছাড়িয়ে আমার গাড়ায় চলে আয়। কদিন আছিস?

পুজোটা থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। হচ্ছে না। দিল্লি থেকে ডেকে পাঠিয়েছে, আবার এক ডেলিগেশনে অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে।

ভ্যানতারা রাখ। তোর ডেলিগেশনও চিনি, তোর অস্ট্রেলিয়াও চিনি। কদিন আছিস তাই বল।

আমি নেই রে। পরশুদিন চলে যাচ্ছি।

তা হলে আজ চলে আয়।

পাগল! আজ দিদি ত্রিশ টাকা কিলোর চিংড়ি আনিয়েছে।

তা হলে কাল?

দেখি। বিনুক কেমন আছে?

ঝিনুক ঠিক ঝিনুকের মতো আছে। ক্যাপটিভ ইন হার ওন শেল।

আমি বাবা তোদের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমগুলো একদম বুঝি না। মানুষের খাওয়া পরার সমস্যা আছে, আধিব্যাধি আছে, দুঃখ টুঃখও আছে, তবে তোদের সব সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার।

তোর সব কিছু বোঝার দরকার কী? তুই যেমন দেশ কি নেতা মদনকুমার হয়ে আছিস তাই থাক না।

মদন খুব হো হো করে হেসে বলে, ইয়েস, মদন ইজ দেশ কি ন্যাতা। মদনাকে খুব সমঝে চলবি, বুবলি!

আর সমঝাতে হবে না বাবা। ন্যাতাদের খুব ভক্তি মান্যি করি। ভাত কাপড় না দিক, কিলটাও আবার না বসায়।

বটেই তো। মদন গম্ভীর হয়ে বলে। তারপর গলাটা এক পা নামিয়ে বলে, আরে শোন। নব হাটির মা এসেছিল আজ। ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চায়।

ওপাশ থেকে মাধবের সাড়াশব্দ কিছুক্ষণ পাওয়া গেল না। বেশ একটু ফাঁক দিয়ে আস্তে করে বলল, ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চায়? নবর বউ সেই গৌরী না?

হাঁ। মদন একটা চাপা শ্বাস ছেড়ে বলে, খুব টেটিয়া বুড়ি। নব জেলে যাওয়ায় ওর বউ বাচ্চা নিয়ে নাকি বুড়ি বিপদে পড়েছে।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যা পারিস করিস। ওদের দোষ কী?

পাগল নাকি? অনেক ব্যাপার আছে।

কী ব্যাপার?

পলিটিকস করতে গেলে সব দিক বিবেচনা করে ডিসিশন নিতে হয়।

তুই কি নবর বউকে চাকরি দেওয়ার মধ্যে পলিটিক্যাল গেইন খুঁজছিস নাকি?

আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু প্লে ইট সেফ, দেখতে হবে মতলবখানা কী। আমাকে ফাঁসাতে চায় কি না।

ধুস শালা। খেতে পাচ্ছে না, তাই তোকে মাতব্বর ধরেছে। এর মধ্যে অন্য মতলবের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?

পাবলিকের মন সবসময়েই ভারী সরল। আমাদের বুদ্ধি একটু প্যাঁচালো।

এই যে একটু আগে বললি মানুষের মনের ঘোরপ্যাঁচ বুঝিস না!

একেবারেই যে বুঝি না তা নয়। একটু একটু বুঝি, তবে তোর বা ঝিনুকের কথা আলাদা, তোদের তো কোনও বাস্তব সমস্যা নেই। তোরা কুঁথে কুঁথে সমস্যা তৈরি করছিস।

আমাদের ঘোরতর একটা বাস্তব সমস্যা রয়েছে। আমাদের কোনও বাচ্চা নেই!

আঃ হাঃ, সে তো আমারও নেই।

তোর নেই কে বলল?

তা হলে আছে বলছিস?

থাকতেই পারে। লেজিটিমেট না তো ইলেজিটিমেট, বিয়ে তো কলি না স্রেফ ভয়ে। পাছে বউ এসে পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার তৈরি করায় বাগড়া দেয়।

বিয়ের বয়স যায়নি ব্রাদার। নাউ আই অ্যাম এ মোর এলিজিবল ব্যাচেলর।

ধুস শালা। এম পি একটা পাত্তর নাকি? আজ আছে কাল নেই।

কেন, লোকের মুখে শুনিসনি, পাঁচ বছর এম পি থাকতে পারলে সাত পুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে চলে যায়।

তা বটে। তা হলে কাল তোকে এক্সপেকট করছি!

দেখা যাক।

দেখা যাক নয়। আমি আর ঝিনুক কাল বাসায় থাকব তোর জন্য।

খুব চেষ্টা করব, না পারলে ফোন করব, তোর বাসার ফোন ঠিক আছে তো?

কপালজোরে আছে। গত মাসেও পনেরো দিন বিকল ছিল, কালও যে থাকবে না তা বলা যায় না।

জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলোর কথাই আমাদের ভাবা উচিত।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তোর মতো গাড়লরা গদিতে বসলে কী করে মানুষ উজ্জ্বল দিক নিয়ে ভাববে?

খুব হেসে মদন বলল, আচ্ছা, আজ এ পর্যন্ত।

বলে ফোন রেখে দেয়।

.

০৫.

বাবা আধো অন্ধকার সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে বসে আছেন। মুখটা অস্পষ্ট, গায়ে একটা সাদা হাফশার্ট, পরনে খাকি রংয়ের প্যান্ট। টেবিলে কনুই, হাতের তেলোয় থুতনির ভর। একটু কুঁজো হয়ে চুপ করে চেয়ে আছেন। ভারী নির্জন চারদিক। শুধু পাখিরা ডাকাডাকি করছিল

খুব। আর বিবি। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল ঝিনুক। সে তখন ছোট, বছর দশেকের মেয়ে। দৃশ্যটা আজও সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে মনে আছে।

বরাবরই বাবা চুপচাপ মানুষ! কঠিন, কর্তব্যপরায়ণ, কম কথার মানুষ। চেহারাটা লম্বা, মজবুত হাড়ের চওড়া কাঠামো, কালো, কর্কশ মুখশ্রী। তবু বাবার তুল্য পুরুষ ঝিনুক কখনও দেখেনি।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে বাবার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল তার। কিন্তু সে স্পষ্টই দেখল, বাবা সেই ঘরে ঠিক বসে নেই। শুধু শরীরটা পড়ে আছে, আসল বাবা অনেক দূরে কোথাও বেড়াতে চলে গেছে বুঝি।

ঝিনুক আস্তে আস্তে সাহস করে এগিয়ে গেল কাছে।

বাবা, তোমার কী হয়েছে?

বাবা আস্তে হাতখানা বাড়িয়ে ঝিনুকের চুলগুলো এলো করে দিল, হাঁটুর কাছে বুক চেপে ঊর্ধ্বমুখে ঝিনুক বাবার অস্পষ্ট মুখ দেখছিল। ভারী দুঃখী মুখ।

বাবা, তোমার মন খারাপ?

না তো। এই একটু ভাবছি।

কী ভাবছ?

তোমাদের কথা।

কেন বাবা?

এমনি। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের কথা ভাবি।

ব্যস, এর বেশি আর কথা হয়নি, তবু কত গভীর কত স্পষ্টভাবে দৃশ্যটা তার কালের চিহ্ন এঁকে রেখেছে আজও মনের মধ্যে!

তুমি বড্ড বেশি বাবা বাবা করো ঝিনুক, বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই একটু অনুযোগের সুরে কথাটা বলেছিল মাধব। তেমন কিছু নয় তবু তৎক্ষণাৎ নতুন স্বামীকে মনে মনে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল সে। কোনও জবাব দেয়নি, ঝগড়া করেনি।

ঝিনুক ভাবে, আমার বাবার মতো যে তোমরা কেউ নও।

পুরুষরা ঝিনুককে কী চোখে দেখে তা সে জানে। পথে ঘাটে যেসব পুরুষ তার দিকে তাকায় তাদের কাছে সে স্রেফ গোলাপি মাংস। মাধবের কাছে সে ভারী একঘেয়ে, বিরক্তিকর, খিটখিটে মেয়েমানুষ। তার যদি ছেলে থাকত তবে সব অন্যরকম হত, পুরুষমানুষের প্রতি এত ঘেন্না থাকত না।

ঘেন্না? না, তাই বা বলে কী করে? পুরুষমানুষকে ঘেন্না পেলে সে কি বাবাকে অত ভালবাসতে পারত?

বাবার কথা ভেবে আজ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ঝিনুকের।

উদাসিনী ঝিনুক তার বটুয়াটা দোলাতে দোলাতে ভারী আনমনে হাঁটছিল, একজনের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা, হয়তো এক্ষুনি, হয়তো একশো বছর পর। কিন্তু হবে, সে মানুষ কেমন হবে তার একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে তার, স্পষ্ট কিছু জানে না। তবে এটুকু জানে, তার অনেকখানিই থাকবে এক প্রদোষের অন্ধকারের মতো রহস্যে ঢাকা। খানিকটা চেনা যাবে, অনেকখানি থাকবে অচেনা।

গড়িয়াহাটা ব্রিজের একদম মাঝখানে অনেকটা উঁচুতে উঠে ঝিনুক একটু ধীর হল। এপাশ ওপাশ দিগন্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখল। কত দূর! কত দুর! পৃথিবীর অন্ত নেই। দুরন্ত বাতাস এসে লাগছে নাকে মুখে। উজ্জ্বল আলো, নীল আকাশ। মানুষ পাছে লাফিয়ে পড়ে

আত্মহত্যা-টত্যা কিছু করে সেই ভয়েই বোধহয় ব্রিজের মাঝ বরাবর দুধারের রেলিং-এর সঙ্গে মস্ত উঁচু জালের বেড়া। জালের ধারে দাঁড়িয়ে একটু দেখতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু রাস্তার লোকজন তাকাবে, ভাববে। ঝিনুক দাঁড়াল না। কিন্তু খুব ধীর পায়ে ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। নীচে একটা নদী থাকলে এই ব্রিজটা আরও কত ভাল লাগত। ঢালুর মুখেই তার মনে পড়ল, মোগলসরাই! মোগলসরাই! সে এক অদ্ভুত ভাল জায়গা। সেইখানে থাকার সময় মাঝে মাঝে জিপ জোগাড় করে তারা পুরো পরিবার বোঝাই হয়ে যেত বারাণসী। মাঝপথে মস্ত ব্রিজ, নীচে গঙ্গা। বাবা সেখানে জিপ দাঁড় করাবেই। আর তখন ওই বয়সে ঝিনুক সেই ব্রিজ থেকে গঙ্গার প্রবহমানতার দিকে চেয়ে মূক হয়ে যেত ভয়ে বিস্ময়ে। শক্ত করে বাবার হাত ধরে থাকত সে। নইলে যে ভীষণভাবে গঙ্গা টানত তাকে। কেবলই মনে হত, অনিচ্ছে সত্ত্বেও হয়তো সে লাফিয়ে পড়বে। আজও উঁচু জায়গা থেকে নীচে জল দেখলে হাত পা কেমন সুলসুল করে তার। সম্মোহিত হয়ে যায়। মনে হয় জল তাকে ডাকে। জল কি প্রেমিক!

আপনমনে একটু হেসে ফেলে ঝিনুক। কী অদ্ভুত সে! জল কি প্রেমিক? একথাটা মাথায় এল কী করে? মনটা বড় উড়ে উড়ে থাকে আজকাল, কোথাও বসতে চায় না। বড্ড বেশি কবিতা পড়ছে বলে নাকি?

ব্রিজ থেকে নেমে ডান ধারে পঞ্চাননতলায় একটু ভিতর দিকে শুক্তির বাসা। অনেক ঘাটের জল খেয়ে কয়েক মাস হল এক কাঁড়ি টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে একতলার ছোট একটা বাসা নিয়েছে। বোন কাছাকাছি আসায় ঝিনুক প্রায়ই একবার ঢু মেরে যায়। বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট শুক্তি জমাট সংসারী। দুটি ছেলের মা। অজস্র সমস্যায় কণ্টকিত। সবসময়েই মুখে একটা ভ্যাবাচ্যাকা ভয় পাওয়া ভাব।

ঝিনুক ঘরে ঢুকতেই শুক্তি বলে উঠল, উঃ দিদি রে, ঝি-এর অভাবে মরে গেলাম। দে না একটা ভাল দেখে ঝি। আজও আমাদেরটা কামাই করেছে। এঁটো বাসন ডাঁই হয়ে পড়ে আছে, অ্যাতো বাসি জামা কাপড় জমে আছে, ঘর মোছা হয়নি, কী যে করি।

ডানার ভর ছেড়ে ঝিনুক মাটিতে নামল। জাগল। চারদিকে চেয়ে দেখে বলল, একটুও টিপটপ থাকতে পারছিস না। কী যে করে রেখেছিস ঘরখানা।

ছেলে দুটো যে হাড় বজ্জাত। সারাদিন গোছাচ্ছি, সারাদিন লণ্ডভণ্ড করছে।

ঝিনুক সামনের ঘরে সোফা কাম বেডের বিছানায় বসে হাঁফ ছেড়ে বলল, ঠিক আছে, আমি গিয়ে পুনমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজকের মতো ঘরদোর সেরে দিয়ে যাক।

ও বাবা! চোখ বড় করে শুক্তি বলে, পুনমকে দিয়ে কী হবে। ও মুসলমান যে!

ঝিনুক আর একটু জেগে ওঠে। তাই তো, মনে ছিল না। মানুষের কতরকম সমস্যা থাকে, যা তার নেই। ঝিনুকের একটু চা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু শুক্তির অবস্থা দেখে আর খেতে চাইল না। উঠতে উঠতে বলল, আচ্ছা, দেখব।

শুক্তি বাইরের ঘরেই বঁটি পেতে আলুর খোসা ছাড়াতে বসেছে। গলা একটু নামিয়ে বলল, এ বাসাও ছাড়তে হবে। পিছন দিকে রেল লাইনের আশে পাশে গুণ্ডা বদমাস ওয়াগন ব্রেকারদের আড্ডা। কালও একটা ছেলেকে তাড়া করে ওই ভিতর দিকে নিয়ে গেল। মেরেই ফেলেছে বোধ হয়, আর কী বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গালাগাল, শোনা যায় না।

ঝিনুক চোখ বড় করে চেয়ে থাকে। পৃথিবীতে এসব-ও ঘটে! কত কী ঘটে! মানুষ কতরকম ভাবে বেঁচে আছে। সে নিজে অবশ্য এতসব টেরও পায় না। বালিগঞ্জের অত্যন্ত নির্জন সুন্দর পাড়ায় চমৎকার ফ্ল্যাটে থাকে সে। নিজস্ব ফ্ল্যাট, কোনও দিন ছাড়তে হবে না। তার কাজের লোকের অভাব কদাচিৎ হয়, কারণ সে প্রচুর টাকা মাইনে দিতে পারে। তবে কি শুক্তির চেয়ে সে সুখী?

শুক্তির দিকে একটু চেয়ে থেকে নিজের সঙ্গে মেলাল সে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। এভাবে মেলানো যায় না। সুখ দুখের তুলনা কিছুতেই হয় না কখনও। শুক্তির বাসায় পা দিলেই তার এক ধরনের কষ্ট হয়, হাঁফ ধরে যায়। সে নিজে নিঃসন্তান আর

শুক্তি দুটি ছেলের মা বলে তার কখনও হিংসে হয় না। শুক্তির ছেলে দুটোকে সে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে তার শুধু মনে হয়, একটা ছেলে থাকলে বেশ হত।

ঝিনুক অনেকটা জেগেছে। একটু ভেবেচিন্তে বলে, এবার তোরা একটা ফ্ল্যাট কিনে নে না।

টাকা কই? ফ্ল্যাটের যা দাম। এই তো দেখ, দেড় ঘরের ফ্ল্যাটের জন্য মাসে থোক চারশো টাকার মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতে কী থাকে বল! আমাদের ওসব হবে টবে না। চিরকাল ভাড়া বাড়িতেই পচে মরব।

বাদবাকি সময় অনেক কথা হল, কিন্তু ঝিনুক তখন মাটি ছেড়ে উড়েছে আবার, ভারী আনমনা।

শুধু উঠবার মুখে শুক্তি বলল, একটা খবর শুনেছিস দিদি?

কী রে?

নীলুকে যে খুন করেছিল, সেই নব গুণ্ডা নাকি জেল থেকে পালিয়েছে।

ঝিনুক খুব আনমনে বলে, তাই নাকি? বলেই হঠাৎ চকে উঠল সে। নীলু! নীলুকে কে খুন করেছে?

তোর ভগ্নীপতি কোথা থেকে শুনে এসে কাল রাতে বলল।

ঝিনুকের ভারী মুশকিল। শত চেষ্টাতেও সে মনটাকে কোনও একটা জায়গায় রাখতে পারে না। কত কথা শোনে, ভুলে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে নব গুণ্ডর কথাও সে ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু হঠাৎ রুমঝুম নুপুর বাজিয়ে শরতের কিশোরী বৃষ্টি এল। দু মিনিট। একটা সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল ঝিনুক। আর তখনই ওই সাদা রোদে মাখামাখি এক অপরূপ রুপালি বৃষ্টির দিকে চেয়ে থেকে মনে পড়ল তার। নব হটি। নব টি কী অদ্ভুত নাম।

লোকটা জেল থেকে ছাড়া পেল কেন? না, ছাড়া পায়নি তো! পালিয়েছে। তাই তো বলছি শুক্তি! রুপোলি বৃষ্টির নাচ দেখে কেন কথাটা মনে হল? একটা সম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই! কিন্তু নবর কথা নয়, বার বার নীলু এসে হানা দিচ্ছে মনের মধ্যে, যেন এক পাগলা বাতাস। ঝিনুকের ভিতরে উড়ে যাচ্ছে কাগজের টুকরো, উড়ছে পর্দা, ভেঙে পড়ছে কাঁচের শার্শি। ওলট পালট। ওলট পালট।

বৃষ্টি থামল। মেঘভাঙা রোদ অজস্র গয়নার মতো পড়ে আছে চারপাশে। গলির মুখে এসে একটা রিকশা নিল ঝিনুক। নইলে চটি থেকে কাদা ছিটকে দামি শিফনের শাড়িটায় দাগ ধরাবে।

বাড়িতে ফিরে ঝিনুক বাইরের ঘরে পাখাটা চালিয়ে একটু বসে। এ তার বহুদিনের অভ্যাস। সেন্টার টেবিলের নীচে থাকে একটা দামি সিগারেটের খালি প্যাকেট।

ঝিনুক ভ্রূ কোঁচকায়। মনে পড়ে না। কার প্যাকেট? কে ফেলে গেল? মাধব তো এ সিগারেট খায় না!

নিচু হয়ে প্যাকেটটা তুলে নেয় ঝিনুক। দু হাতে ধরে চেয়ে থাকে যত্নে। কোনও মানে হয় না। মনে পড়বে না।

কিন্তু চোখ তুলতেই মনে পড়ল। ঠিক এই সোফায় বসে কাল দুপুরে অনেক সিগারেট খেয়েছিল বৈশম্পায়ন। কী অদ্ভুত ওর সেই বসে থাকা! ওর বউ শর্মিষ্ঠা গেছে পুজোর বাজার করতে! ওর ছোট ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। আর ও বাইরের ঘরে অদ্ভূত মুখ করে বসে আছে।

ঝিনুক জানে। সব জানে। বৈশম্পায়ন কেন আসে ফিরে ফিরে। ঈশ্বর।

বার বার উঠি উঠি করছিল বৈশম্পায়ন। বাইরে গিয়ে ঘড়ি দেখছিল শর্মিষ্ঠা ফিরছে কি না। আসলে তো তা নয়। এই একা বাড়িতে ঝিনুকের মুখোমুখি বসে থাকা তার কাছে অস্বস্তিকর। বড় অতিকর।

মনে মনে ভারী হাসে ঝিনুক। অত যদি লজ্জা তবে ফটো তুলেছিলে কেন?

ব্যাপারটা আর কেউ জানে না। এমনকী বৈশম্পায়নও জানে না যে, ঝিনুক জানে। বৈশম্পায়নের কাছে কথাটা কখনও বলেনি সে। স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে যেমন প্রথম পরিচয় এবং তারপর কিছু ঘনিষ্ঠতা হয় তার বেশি কিছুই করেনি ঝিনুক। কিন্তু তার ই একটা ঘটনার স্মৃতি আছে। বৈশম্পায়নকে এই তার প্রথম দেখা নয়, বৈশম্পায়নেরও নয় ঝিনুককে প্রথম দেখা।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকতে বলাই সিংহী লেন ধরে আমহার্স্ট স্ট্রিট পেরিয়ে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে যেত কিনুক। আর তখন ডান দিকে আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে রামমোহন রায় হোস্টেল থেকে কয়েকটা ছেলে রোজ লক্ষ করত তাকে।

ঝিনুক শুধু একজনকেই লক্ষ করেছে। অনুগত, বিশ্বাসী ভক্তের মত, দোতলার এক জানালায় তার কামাই ছিল না কখনও। তবে সে মাঝে মাঝে নেমে আসত, পিছু নিত। বহু দূর ঘুরে উল্টো কি দিয়ে এসে মুখোমুখি হত। তবে সাহসের অভাবে কখনও কথা বলেনি। সেই নীরব ভালবাসা কিশোরী ঝিনুকে বাজে বকুলের মতো ঝরেছে তখন। এক বছর গড়িয়ে যাওয়ার মুখে একদিন ঝিনুক দোতলায় ছেলেটিকে খুঁজে পেল না। একটু অবাক হয়েছিল সে। ছেলেটা গেল কোথায়?

ছেলেটা আসলে কোথাও যায়নি, শুধু জায়গা বদল করেছিল। নীচের তলায় হোস্টেলের কমনরুমে টুকটাক টেবিল টেনিসের আওয়াজ পেয়েছে ঝিনুক। সেই কমনরুমের খোলা জানালায় চোখের কাছে ক্যামেরা তুলে তাক করে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা। ঝিনুক তাকাতেই

শাটার টিপল। তারপর খুব ভয়-পাওয়া ক্ষীণ গলায় বলল, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আর দেখা হবে না।

ঝিনুক জবাব দেয়নি। আজকালকার ছেলেমেয়ে হলে কবে লটরপটর করে ফেলত। কিন্তু তারা পারেনি। শুধু একটু মনখারাপ হয়েছিল ঝিনুকের। আর দেখা হবে না?

অবশ্য না হলেই বা কী? উঠতি বয়সের সুন্দরী ঝিনুক তার পরেও কত পুরুষের দৃষ্টিতে স্নান করেছে।

কিন্তু বৈশম্পায়ন ঠিক বলেনি। দেখা তো হল। কেউ কাউকে চেনা দিল না। কিন্তু চিনতে পারল ঠিকই। ঘটনাটা মনেই থাকত না ঝিনুকের, যদি সেদিন বৈশম্পায়ন ছবি না তুলত। বড় জানতে ইচ্ছে করে, সেই ছবিটা আজও বৈশম্পায়নের কাছে আছে কি না।

সিগারেটের প্যাকেটটা কিনুক আরও কিছুক্ষণ দেখল চেয়ে। তারপর উঠে গিয়ে ট্রাশ বিন-এ ফেলে দিয়ে আবার সময় শুনল, ফোন বাজছে।

ঝিনি?

হ্যাঁ।

একটা খবর আছে।

কী?

মদন এসেছে।

মদনাটা আবার কে?

আরে মদনা, আমাদের মদনা। এম পি।

তাতে কী হল?

না বলছিলাম, ওকে কাল খেতে বললে কেমন হয়।

সে তুমি বুঝবে। আমি কী বলব?

না, না, মানে বাড়িতে তেমন কোনও ঝামেলা কোরো না। ভাবছিলাম, চীনে রেস্টুরেন্টের খাবার নিয়ে যাব।

ভয়টা তো খাবার নিয়ে নয়।

ও হো হো, তুমি যা পাজি হয়েছ না! আচ্ছা, এবার খুব ছোট একটা বোতল খোলা হবে।

সে তুমি খোলো গিয়ে। কাল আমি শুক্তির বাসায় গিয়ে বসে থাকব বিকেলে।

আরে, কী যে মুশকিল। এবার ঝামেলা হবে না, ঠিক দেখো। আরে, আমাদেরও তো বয়স হচ্ছে। আগের মতো বেহদ্দ ছেলেমানুষ আছি নাকি?

তোমার ফ্ল্যাট, তাতে তুমি যা খুশি করবে। আমার কী? আমি থাকব না।

এই কি প্রেম ঝিনি?

সেটাও তুমি বুঝে দ্যাখো।

এটা প্রেম নয়।

আমি তো প্রেম চাই না।

তা বটে। তুমি সত্যিই প্রেম চাও না। মাধবের একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তা হলে ড্রাই হোক?

সে তোমার খুশি।

বিয়ারে আপত্তি নেই তো! ওটা তো মদের ক্যাটাগোরিতে পড়ে না।

ওসব আমি জানি না। মদনার গলা জড়িয়ে ধরে তুমি বদনা বদনা খাও। আমি সং সেজে বসে থাকতে পারব না।

না হয় তুমিও একটু খাবে। স্বাদটা জেনে রাখা ভাল।

আমার স্বাদের দরকার নেই।

আচ্ছা তা হলে ড্রাই। এক্সট্রিমলি ড্রাই। ও কে?

কী একটা জরুরি কথা বলা দরকার যেন মাধবকে। কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ বলা দরকার। ভীষণ দরকার।

শোনো, একটু ধরে থাকো। জরুরি কথা আছে।

মনে পড়ছে না?

না। তবে পড়বে।

ধরে আছি। তুমি বরং কথাটা মনে করার চেষ্টা না করে বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখে জল দাও। গুনগুন করে একটু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও। মনটাকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখো। তা হলে হঠাৎ মনে পড়বে।

আঃ, একটু চুপ করো না! এক্ষুনি মনে পড়বে।

চুপ করছি। কিন্তু তুমি একটু অন্য কথা ভাবো না ঝিনি! মনে করো আমরা সেই উশ্রী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছি। তুমি উঠতে ভয় পেয়েছিলে বলে ওঠা হল না। মনে পড়ে?

মোটেই ভয় পাইনি। এক সাধু আমাদের উঠতে বারণ করেছিল।

ওই হল। সাধু ভয় দেখিয়েছিল, আর তুমি ভয় পেয়েছিলে।

সাধু ভয় দেখায়নি। সাবধান করেছিল।

এবার মনে পড়েছে?

কী?

জরুরি কথাটা?

না, কিন্তু মনে পড়বে।

মনে করার চেষ্টা কোরো না। খবরদার। বরং আমাদের সেই বীভৎস মধুচন্দ্রিমার কথাটা মনে করো। নিছক বাঙালি বলে কিছু ছেলে সেবার সমুদ্রের ধারে আমাদের কী রকম হেকেল করেছিল। নতুন বউয়ের সামনে আমি একটু রুস্তম হতে গিয়ে কী রকম...

আঃ, চুপ করো না। ওসব কথা বলে আরও সব গুলিয়ে দিচ্ছ আমার। দাঁড়াও আসছি।

এই বলে ক্র্যাডলের পাশে রিসিভার রেখে দ্রুত পায়ে শোওয়ার ঘরে ঢোকে ঝিনুক। খুব ভাল সুগন্ধ মাখলে তার মন স্বচ্ছ হয়ে যায়। নিউ মার্কেট থেকে কেনা দুর্দান্ত একটা জার্মান সেন্ট আছে। ক্যাবিনেট খুলে বুকে সেইটে দুবার স্প্রে করে ঝিনুক। সম্মোহনের মতো গন্ধ। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

শিশি জায়গা মতো রেখে উঠে আসতে গিয়ে নীলুর ছবিটা চোখে পড়ল। ভাগ্যিস!

ফোন তুলে ঝিনুক বলে, নীলুকে যে খুন করেছিল তাকে মনে আছে?

একটু চুপ করে থেকে মাধব যখন কথা বলল ফের, তখন সে অন্য মানুষ। এতটুকু রস-রসিকতা নেই গলায়। ধীর স্বরে বলল, আছে। কেন?

তার নামটা কী?

নব হাটি।

সেই নব জেল থেকে পালিয়েছে।

এবার এতক্ষণ চুপ করে থাকে মাধব যে, ঝিনুকের একবার সন্দেহ হয় ওপারে কেউ নেই।

শুনছ?

শুনছি। তোমাকে কে বলল?

শুক্তি।

শুক্তি জানল কী করে?

ওকে বলেছে বিনায়ক।

বিনায়ক কার কাছে খবর পেল?

অত শত জিজ্ঞেস করিনি। তবে মনে হল, খবরটা জরুরি। তোমাকে জানানো দরকার।

খবরটা খুবই জরুরি। ভীষণ জরুরি। তোমাকে ধন্যবাদ ঝিনি।

৬-১০ শুয়ে বসে সময় কাটাচ্ছে বৈশম্পায়ন

০৬.

কাল থেকে শুয়ে বসে সময় কাটাচ্ছে বৈশম্পায়ন। ডাক্তার বলেছে, রেস্ট নিন। কিন্তু মনে অস্থিরতা থাকলে কী করে মানুষ বিশ্রাম করবে কে জানে।

কালীঝোরার ডাকবাংলো থেকে সেই কবে তিস্তার উপত্যকা দেখেছিল বৈশম্পায়ন! সেই উপত্যকা আর নদী কী করে আস্তে আস্তে হয়ে গেল মৃত্যুর উপত্যকা, মৃত্যু নদী। এত সুন্দর একটি নিসর্গ দৃশ্যকে মৃত্যুর রং মাখিয়েছে কে? সে নিজেই কি? নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে বৈশম্পায়ন।

আলিপুরদুয়ার কোর্টে সে বেশ মনের সুখে রাজত্ব করছিল। বাঁশবনে শেয়াল রাজা, বখেরা বাঁধল মানুষের ভাল করতে গিয়েই। বছুরে বন্যার পর সেবার গাঁ গঞ্জে যখন ভীষণ অসুখ বিসুখ দেখা দিল তখন সরকারি ডাক্তারদের অনেক বলে কয়েও সে গ্রামে যেতে রাজি করাতে পারেনি। নতুন চাকরিতে তখন উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সে টগবগ করছে। একটা সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই সে ডাক্তারদের গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছিল। প্রথম রাউন্ডে জিতেই গিয়েছিল সে। ডাক্তাররা গ্রেফতার হল, জামিন পেল, তাদের বিরুদ্ধে কেস তৈরি করতে লাগল পুলিশ। কিন্তু এই ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে গেল কলকাতায়। কাগজে খবর বেরোল। প্রতিক্রিয়াটা হল বিশাল রকমের। আলিপুরদুয়ারের ডাক্তাররা এই ঘটনার প্রতিবাদে রুগি দেখা বন্ধ করে দিল। সে এক বিশাল হই-চই। পুরো ব্যাপারটাই তার হাতের বাইরে চলে গেল, যখন একটি বড় রাজনৈতিক দল লেগে গেল পিছনে। ঢোজই অর অফিসে আর বাড়িতে মিছিল আসতে লাগল। গদি ছাড়ো, গাব্যাক ইত্যাদি ধ্বনি দিত তারা। দু দফায় আটচল্লিশ ঘটা করে ঘেরাও থাবল সে।চিতু নামে একটা ছোকরা প্রায়দিনই মিছিলে বক্তৃতা দিতে উঠে যা খুশি বলত তার উদ্দেশে। তখন বৈশম্পায়নের পাশে পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই, একটা লোকও তার পক্ষে নয়। কলকাতা থেকে বড়

অফিসার তদন্তে এসে খুব সন্তোষ দেখালেন না বৈশম্পায়নের প্রতি। বৈশম্পায়ন একবার তার নিরাপত্তার কথা তুলেছিল। অফিসার বললেন, পুলিশ প্রোটেকশন তো আছে।

এ অবস্থায় পুলিশ কী করবে? ওরা কো-অপারেট করছেনা।

তা হলে কলকাতা চলে যান। ছুটি নিন।

তে-এঁটে, গেঁতো বৈশম্পায়ন তবু ছিল। তখন ডুশকি হবে, তাই শর্মিষ্ঠা ছিল কলকাতায় কাপের বাড়িতে। হঠাৎ টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির, শর্মিষ্ঠা সিরিয়াস। কাম শার্প।

বৈশম্পায়ন টেলিগ্রাম পেয়ে পাগলের মতো কলকাতায় রওনা হচ্ছিল। বাধা পেল ঘেরাওরে।

চিতু মধ্যমণি। বৈশম্পায়ন টেলিগ্রামটা তাকে দেখিয়ে মিনতি করল; বড় বিপদ আমার। এ সময়টায় যদি কনসিডার করেন।

চিতু মৃদু হেসে বলল, এটা পুরো ফলস টেলিগ্রাম। চালাকি করবেন না। এসব কায়দা অনেক পুরনো।

তখন শর্মিষ্ঠা ছিল ভীষণ প্রিয়, অকল্পণীয় আপন। সেই শর্মিষ্ঠা বাঁচে কি মরে ঠিক নেই, আর কতগুলো ইদুর তাকে আটকে রাখবে? বৈশম্পায়ন মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। লাফিয়ে গিয়ে টুটি টিপে ধরেছিল চিতুর; তোকে আজ খুন করে ফেলব শুয়োরের বাচ্চা।

হাসপাতালে যখন সংজ্ঞাহীন থেকে আধো চেতনায় ফিরে আসছিল বৈশম্পায়ন তখনই সে জীবনে প্রথম শুনেছিল মৃত্যু-নদীর গান। চারদিকে হিম সাদা অনড় পাথর, নির্জন উপত্যকা আর উৎস ও মোহনাহীন এক নদী। সেই থেকে নদী সঙ্গে আছে। দপ করে চেতনা জুড়ে জেগে ওঠে। তখন সংসারের সব কিছুই অর্থ হারিয়ে ফেলে।

চিতু মিথ্যে বলেনি। টেলিগ্রামটা ফলসই ছিল বটে। সে যখন আলিপুরদুয়ারের হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, তখন কলকাতার এক নারসিং হোমে নিরাপদে শর্মিষ্ঠা আট পাউন্ডের স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে প্রসব করেছে। ডুমকির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এল বৈশম্পায়নের জীবনে পরিবর্তন। ডুমকি লক্ষ্মীমন্ত ছেলে।

রাতে দুটো কামপোজ খেয়েছিল বৈশম্পায়ন। তবু যে, খুব ভাল ঘুম হয়েছে এমন নয়। শরীরে গভীর ক্লান্তি, মনে হাজার বছরের স্মৃতির ভার। ডাক্তার বলেছে ওভারওয়ার্ক, টেনশন, প্রেশার একটু কম।

কিন্তু আসলে তা তো নয়।

শর্মিষ্ঠা আজও বেরোচ্ছে পুজোর বাজার করতে কলাত্র এক তরঙ্গ সুবিধে করতে পারেনি। বুবুম থাকবে বাচ্চা বি সাবিত্রীর কাছে। বৈশম্পায়নও একটু একা হতে চাইছে জীবনে একার জন্য একটু সময় করে নেওয়া যে কত প্রয়োজন।

শোওয়ার ঘরে কাপড় বদলাতে এসে শর্মিষ্ঠা বলে, আজ আর একদম সিগারেট খাবে না।

হু। বালিশে মুখ ঢুকিয়ে রেখে বৈশম্পায়ন জবাব দেয়।

হু নয়, একদম খাবে না।

আচ্ছা।

আমার যদি দেরি হয় তবে সাবিত্রী তোমাকে খেতে দেবে। খেয়ে নিয়ো।

আচ্ছা।

শর্মিষ্ঠা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখের প্রসাধন সেরে নিল। এবার শাড়ি পরবে। স্টিলের আলমারির দরজা ঘড়াম করে খুলে শাড়ি বাছতে বাছতে বলল, ঝিনুক একটু অন্যরকম। আমাদের মতো নয়। না?

বৈশম্পায়ন জবাব দেয় না।

কাল অতক্ষণ ওদের বাড়িতে বসে থাকলাম ও কিন্তু একদম পাত্তা দিতে চাইছিল না! অথচ এক একদিন দেখলে এমন করে যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছে।

বৈশম্পায়ন এবারও জবাব দেয় না।

শর্মিষ্ঠা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ওদের সম্পর্ক কেমন গো?

কাদের?

ঝিনুক আর মাধববাবুর?

খুব ভাল। দুজন দুজনকে চোখে হারায়।

শর্মিষ্ঠা মাথা নেড়ে বলে, আমার মনে হয় না।

নাই বা হল, তাতে ওদের কিছু যায় আসে না।

তুমি তো সব ভাল দেখো। আমার মনে হয় ওদের সম্পর্কটা খুব কোল্ড।

তুমি জানো না।

ওরা স্বামী স্ত্রী আলাদা খাটে শোয়। জানো?

জানি! ওটাই আজকালকার ফ্যাশন।

একসঙ্গে না শুলে আবার স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা কী? আমি তা কিছুতেই পারব না।

একসঙ্গে শোওয়াটাই কি ভালবাসা?

তা নয়। তবে ভালবাসা থাকলে আলাদা শোওয়ার কথা ভাবাই যায় না।

তোমার সব অদ্ভুত যুক্তি। বৈশম্পায়ন একটু হাসে, খাট আলাদা বলেই কি মনও আলাদা?

শর্মিষ্ঠা রেগে গিয়ে বলে, তোমরা পুরুষরা কিছু বোঝে না। কেবল তত্ত্ব দিয়ে সব জিনিসকে বিচার করো। মানুষ তো থিয়োরি নয়। তার অনেক ব্যাপার আছে। আমি কাল পুনমের সঙ্গে কথা বলেও বুঝলাম, ওদের সম্পর্ক তেমন ভাল নয়।

গোয়েন্দাগিরি করছিলে?

একে গোয়েন্দাগিরি বলে না। ওদের ফ্ল্যাটটা অত সুন্দর, অত সাজানো, ওদের অত টাকা, দেখলে মনে হয় ভাগ্য যেন ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু বেশি ভাল তো ভাল নয়। তাই ভাবছিলাম কোথাও একটু গোলমাল আছেই।

তাই ঝিয়ের কাছে খোঁজ নিচ্ছিলে?

খোঁজ আবার কী? কথা বলছিলাম। বলতে বলতে অনেক কথা ফাঁস হয়ে গেল।

কী কথা ফাঁস হল?

মাধববাবু নাকি আজকাল খুব মদ খায়।

বরাবরই খেত।

আজকাল বেশি খায়।

না, বরং ঝিনুকের শাসনে আজকাল কমিয়েছে।

তুমি জানো না।

আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি।

শর্মিষ্ঠা আপস করে বলল, আচ্ছ সে না হয় মানলাম। কিন্তু ঝিনুক নাকি একদম বাসায় থাকতে চায় না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

তাতে কী?

বোঝো না কেন? অত সুন্দর ফ্ল্যাটেও ওর মন বসে না কেন এটা তো ভাববে?

ও বরাবরই উড়নচণ্ডী।

আচ্ছা বাবা। তুমি যে বিনকের পক্ষ নেবে তা জানতাম। যা ড্যাব ড্যাব করে দেখছিলে ওকে।

বৈশম্পায়ন একটা ধমক দেয়, বাজে বোকো না। কাল আমার যা শরীরের অবস্থা ছিল তাতে মেরিলিন মনরোর দিকেও তাকানোর মেজাজ ছিল না।

শর্মিষ্ঠা সাবিত্রীকে কাজ-টাজ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একা হয়ে বৈশম্পায়ন উঠল। স্টিলের আলমারির মাথায় একটা অব্যবহৃত অ্যাটাচি কেস আছে তার। সব সময়ে চাবি দেওয়া থাকে। সেইটে নামিয়ে খুলল বৈশম্পায়ন। একটা পুরনো মনিব্যাগের খোপ থেকে সোয়া দুই ইঞ্চি বর্গ মাপের ফটোটা বের করে।

ঝিনুক! কী সুন্দর!

যে ভইগল্যান্ডার ক্যামেরায় ছবিটা তোলা সেটাও বহুকাল আগে চুরি হয়ে গেছে। ঝিনুক পরস্ত্রী।

ছবিটা তবু কত জীবন্ত! সাদা ফ্রক পরা ঝিনুক ডান হাত তুলে কোমরের বেল্টটা ঠিক করছে। বা ধারে ঝুলছে বইয়ের ব্যাগ। বব করা চুলে রিবন বাবা। পিছনে লায় বাড়ির

দেয়ালে ইটের খাঁজে খাঁজে সালে রোদ আর ছায়ার চৌখুপি। একটা জব চারা। এই তত যেন গত কালকের কথা।

মেজদা!

একটু চমকে বৈশম্পায়ন তাকিয়ে দেখে, ঘরের দরজায় জয়। ভারী লজ্জা পেয়ে ছবিটা বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলতে গিয়ে আরও ধরা পড়ে যায় সে। জয় অবাক হয়ে তাকিয়ে তার বটুকু অপকর্ম লক করল। তবে কোনও প্রশ্ন করল না।

কী খবর? আজ অফিসে যাসনি?

তুমিও তো যাওনি।

আমার শরীরটা ভাল নেই।

পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা জয় ঘরে ঢুকে একটা মোড়ায় বসে বলে, কাল মদনদা এসেছে।

জানি।

কাল থেকে মদনদার সঙ্গে ঘুরছি। ওঃ, কত মিটিং, কত কনফারেন্স, আর কী সব লোক! জয়ের চোখে একটা সম্মোহিত ভাব!

জয় যে মদনের একজন চামচা তা বৈশম্পয়ান জানে এবং মোটেই ভাল চোখে দেখে না। একটু বিরক্ত হয়েই বলে, ওর পিছনে ঘুরছিস কেন?

মদনদাই বলল, জয় আমার সঙ্গে একটু থাক!

তাই থাকলি? তোর কাজকর্ম নেই?

কাজকর্ম আবার কী? অফিস তো? তা সেই অফিসের চাকরিও তো মদনদাই করে দিয়েছে। ও চাকরি যাবে না। মদনদার সঙ্গে ঘুরলে খুব তাড়াতাড়ি ফিড ক্রিয়েট হয়।

বৈশম্পায়ন একটু অবাক হয়ে বলে, কীসের ফিল্ড?

পলিটিক্যাল ফিল্ড! গতকাল স্টেট সেক্রেটারির সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা হল। ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের পার্টি আবার কেশ শক্ত হয়ে উঠছে। অবশ্য অপোজিশনও আছে। নিত্য ঘোষ মদনদার লিডারশিপ মানতে চাইছে না।

জয় হয়তো ভবিষ্যতে এম পি বা মিনিস্টার হতে চায়। ভেবে বৈশম্পায়ন একটু দীর্ঘশ্বাস ফেল। ভাইদের মধ্যে এই জয়টাই সবচেয়ে গবেট। মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, বুদ্ধিশুত্তি তেমন নয়। সু ওই হয়তো একদিন মীটী হয়ে বসবে। কিছুই অসম্ভব নয়। বৈশায়ন কিছু বলার খুঁজে না পেয়ে গম্ভীর মুখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, ভাল।

তোমাকে বলতে এলাম, মদনা তোমার সঙ্গে একটু দেখাতে চেয়েছে।

কেন?

বলল, কী দরকার আছে। বহুকাল দেখা হয় না। আজ বিকেলে কেয়াতলায় মাধবদার বাড়িতে রাত্রে তোমার খাওয়ার নেমন্তন্ন। ওখানে মদনদাও আসবে।

মাধবের বাড়িতে! বলে আবার ভ্রূ কোঁচকায় বৈশম্পায়ন। কিন্তু তার বুকের মধ্যে ধক ধক করে ধাক্কা লাগে। ঝিনুক! কী সুন্দর।

একটা খবর শুনেছ মেজদা?

কী খবর?

নব হাটি জেল থেকে পালিয়েছে

সামান্য চমকে উঠে বৈশম্পায়ন বলে, সেই ডেঞ্জারাস ছেলেটা না? যে নীলুকে খুন করেছিল?

হ্যাঁ, একসময় মদনদার হয়ে খুর খাটত। পরে বিট্রে করে।

কী করে পালাল?

জেলখানার লোকদের হাত করেছিল বোধ হয়। মামলার সময় কোর্টেই বলেছিল, জেল থেকে বেরিয়ে প্রত্যেককে দেখে নেবে।

কাকে দেখে নেবে?

যারা ওকে খুনের মামলায় ফাঁসিয়েছে। বলে জয় একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়ে বলে, কেউ-কেউ বলে বটে যে, নব খুনটা করেনি। তবে আমি জানি, করেছিল।

তুই কী করে জানলি?

মদনদা বলেছে।

মামলার সময় তুই কোর্টে যেতিস?

রোজ। সব সওয়াল জবাব মনে আছে।

নব দোষ কবুল করেছিল?

না। বার বার শুধু বলত, দোস্তকে দোস্ত কখনও খুন করতে পারে? নীলু আমার জিগির দোস্ত

বৈশম্পায়ন মুখ বিকৃত করে বলে, এ খুনটা না করলেও নব আরও বহু খুন করেছে। সে সবের জন্য ওর সাত বার ফাঁসি হওয়া উচিত।

জয় মাথা নেড়ে বলে, সে ঠিক কথা। কিন্তু নীলুর কেসটায় ওর খুব প্রেস্টিজে লেগেছিল। জজকে বলেছিল, আমার হাতে অনেক লাশ পড়েছে। সে সব কেসে আমাকে জেলে দিন, ফাঁসি দিন, কোই বাত নেহি। কিন্তু নীলুর কেসে আমাকে ঝোলাবেন না। আমি আমার দোস্তকে খুন করিনি।

এখন নব জেল থেকে বেরিয়ে কি সোধ তুলবে নাকি?

জয়ের মুখটা একটু বিবর্ণ দেখায়। তবে গলায় জোর এনে বলে, অতটা কি করবে? কে জানে। তবে নব ক্ষেপে গেলে অনেক কিছু করতে পারে। আজ সকালে খবরটা শোনার পর থেকে মদনদাও একটু ভাবনায় পড়েছে। আর মজা দেখো, গতকালই নবর মা এসেছিল নবর বউয়ের জন্য মদনদার কাছে চাকরি চাইতে।

মদন কি চাকরি দেবে?

মদনদা তো কাউকে না বলে না। চেষ্টা করবে বলে বুড়িকে কাটিয়ে দিয়েছে। পরে আমাকে বলেছে নবর বউকে চাকরি দিলে পলিটিকাল রি অ্যাকশন খারাপ হবে। কিন্তু আজ সকালে খবরটা পাওয়ার পর মদনদা ডিসিসন চেঞ্জ করেছে।

চাকরি দেবে?

চেষ্টা করবে।

রাতারাতি মত পাল্টে ফেলল?

পাল্টানোই ভাল। নব বেরিয়েছে। কখন কী করে বসে ঠিক নেই। জানের পরোয়া নেই তো।

মদন তা হলে ভয় পেয়েছে?

না না। মদনদা অত ডরায় না। কত খুন জখম পার হয়ে এসেছে।

বৈশম্পায়ন মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ কিন্তু তখন তো এমপি ছিল না।

জয় কথাটার অর্থ ধরতে পারল না। বলল, তা ছাড়া মদনদার নাগাল, পাওয়া কি সোজা? শ্রীমন্তদা আছে, আমরা কাছি, ভি আই পি বোলএ কথা। চাইলেই পুলিশ এসে যাবে। দুদিন বাদেই যাচ্ছে দিল্লি হয়ে অস্ট্রেলিয়া। নব মদনদাকে পাবে কোথায়?

বৈশম্পায়ন চিন্তিত মুখে বলে, শুধু মদনই তো নয়, আরও অনেকের ওপর নবর রাগ আছে।

সবচেয়ে বেশি রাগ মাধবদার ও। মাধরম্বার চোখের সামনেই তা খুটা হয় নিজের ভাইয়ের ব্যাপারে তো মধবুদা স্মিথ্যে স্বাক্ষী দেবে না।

বৈশম্পায়ন মাধব আর নীলর সম্পা জানে। কিন্তু সে কিছু বলল না। ব্যাপারটা মাধর চাপা রাখতে চায়। বাইরের কেউ তেমন জানে না। বৈশম্পায়ন জিজ্ঞেস করে মামলায় দুই ছিলি না?

না। আমি কোর্টে যেতায়।

নব তোকে চিনে রাখেনি তো?

জয় হাসে নব আমাকে এমনিতেই চেনে। তবে নীলু হাজরার ব্যাপারে নয়।

তবু সাবধানে থাকিস।

আমার কোনও ভয় নেই। আজ উঠি। তুমি কিন্তু বিকেল-বিকেল মাধবদার রাড়ি চলে যেয়ো।

জয় চলে গেলে বৈশম্পায়ন কিছুক্ষণ নব হাটি মাধব আর মৃদনের কথা ভাবৰুর চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁধ ভাঙা ঢেউয়ের মতো এল একটাই চিন্তা আজ আবার ঝিনকের সঙ্গে দেখা হবে।

.

০৭.

একজন এম পির উচিত খুব ভোরবেলা উঠে সূর্যোদয় দেখা। একজন এম পির উচিত কিছুক্ষণ পাখির গান শোনা। একজন এম পির উচিত ভোরবেলা কিছুক্ষণ নিরুদ্বেগ চিত্তে বেড়ানো। গুনগুন করে একটু গানও তার করা উচিত। আর উচিত দিনের মধ্যে কিছুটা সময় একা একা থাকা এ সেই সময় যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে একটু আত্ম-বিশ্লেষণ করা। একজন এম পির পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে কিছুক্ষণ তার ভুলে যাওয়া উচিত যে, সে একজন এম পি। যদি সে তা পারে তবে একজন এম পির উচিত সুযোগ পেলেই বাচ্চাদের মুখ ভেঙানো।

মদন সাধারণত সকালে উঠতে পারে না। অনেক রাত জেগে কিছু লেখাপড়া করা তার স্বভাব। বস্তুত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একমাত্র রাত বারোটার পর ছাড়া সে এসব করার সময় পায় না। ফলে ভোরবেলা উঠতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায় খুব।

আজ ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। ঘুম ভেঙেই মদন একেবারে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। রোজ ঘুম ভাঙার দেড় দুই মিনিটের মধ্যেই তার মনে পড়ে যায় যে, সে একজন এম পি। আজ তা পড়ল না। দিদির রাইরের ঘরের জানালা দিয়ে জাোের একটু তাস আসছিল। কাছে পিঠে রুগণ কিছু গাছপালা এখনও আছে। বাতাসে তারই নির্ভুল গন্ধ। রাতে কোনও সময়ে একটু বৃষ্টিও হয়ে গিয়ে থাকবে। ভেজা ভাবটা বাতাসে এখনও রয়ে গেছে। ফলে ভোরবেলাটি খুবই চমৎকার মনে হচ্ছিল মদনের।

সে উঠে টক করে বেসিনে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা মারল কিছুক্ষণ। চোখ কট করে উঠল জ্বালায়। এখনও শরীরে যথেষ্ট ঘুম দরকার। পায়ের দিকে সোফার ওপর কাকের ছেড়ে রাখা ধুতি আর পাঞ্জাবি অভ্যস্ত হাতে এক মিনিটে পরে নেয় মদন। সময় নেই। এই ভোরবেট বৃথা যেতে দেওয়া যায় না।

দিদি, বলে একটা ডাক দিতেই চিরু ঘড়া দেয়, কী রে? বেরোচ্ছিস নাকি?

পার্ক থেকে আসছি একটু ঘুরে। দরজাটা দিয়ে দাও।

বলেই আর দাঁড়ায় না মদন। বেরিয়ে হন হন করে কালীঘাট পার্কের দিকে হাঁটতে থাকে।

আকাশে বাদলার মেঘ কেটে যাচ্ছে। ওই শুকতারা। মদন একটু চেয়ে দেখল। এঝর দেরিতে বড় বেশি বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরে আর পুবে। ভেসে যাচ্ছে, সব ভেসে যাচ্ছে। প্রতিবারই ভাসে এবং তার জন্য কেউ কিছু করে না।

আমি একজন এম পি, এ কথাটা এতক্ষণে মনে পড়ল মদনের। নির্জন রাস্তায় সে একটু শব্দ করেই বলে ওঠে, দ্যাখ শালা মদনাকে দ্যাখ। শালা নাকি এম পি! হেঃ হেঃ!

সতীশ মুখার্জি রোডের পুরনো মসজিদের হাতায় গাছে গাছে পাখি ডাকছে। কে রে পাখি, না ছাড়ে বাসা-খনার বচন না? বাকিটা মনে নেই মদনের। তবে এইটুকু মনে আছে, ডাকে রে পাখি, নাছাড়ে বাসা।

হ্যাঁ বৃষ্টি। খুব বৃষ্টি হচ্ছে এবার। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমি কী করতে পারি? মদনা তো ভগবান নয় বাপ, একজন বুরবক এম পি মাত্র। যা, মানছি এম পিরা অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু তা বলে বানভাসি দেশে ডাঙামি বের করার মতো এলেম তার নেই। তবে মদনা ফিল করে বাপ। ফিল করে। পাখিরা ৪ ডাকছে। মদন একবার পুরনো মসজিদটার দিকে তাকিয়ে বলে, দেখে নে শালারা এক আস্ত এম পিকে। তেরা হতভাগারা জামাকাপড় পরতে শিখলি না, পার্লামেন্ট বানাতে পারলি না, হেল লাইফ কেঞ্চল কিচমিচ!

মদন গুনগুন করে উ হু হু উ হ হ করে গাইতে লাগল। তার গলায় সুর নেই। তার জন্য পরোয়া করে না সে। উহহ, উহহ করেই যেতে থাকে।

ডান দিকে পার্ক। কতে গিয়ে মদন একটু দাঁড়ায়। শালারা গাছগুলো কেটেছে। বাচ্চাদের জন্য দোলনা ছিল, স্লিপ ছিল, সেগুলো লোপাট করেছে। ঘাসজমিতে টা ফেলেছে। খানিক জায়গা কেটে নিয়ে রঙ্গশালা বানিয়েছে। কারও কিছু করার নেই। ভেসে যাক, ব ভেসে যাক।

মদন পার্কে ঢুকে পড়ে। ভোর েহয়ে এসেছে। পার্কে কিছু ভূতুড়ে রের বা কে মর্নিং ওয়াক সেরে নিচ্ছে। মদন তাদের কক্ষপথে নিজেকে ভিড়িয়ে দেয়। উ হু হু গানটাও চলতে থাকে। এই ভেলো পার্কে বেড়াতে আর কে আনন্দ হচ্ছে। যা, খুব আনন্দ হচ্ছে। আনন্দ। নিজেকে এমপি বলে একেবারেই মনে হচ্ছে না তার।

কিন্তু মনে না পড়ে উপায় আছে? ব্যাটারা পড়িয়ে ছাড়ে। ক্যাংলা চেহারার টেকো একটা লোক গাদি খেলার মতো পথ আটকে একগাল হেসে বলল, দাদা মর্নিং ওয়াক-এ বেরিয়েছেন বুবি?

মদন চিনল। তবে নামটা মনে পড়ল না। বলল, এই একটু। তা কী খবর?

আমাকে চিনতে পারছেন তো! আমি হরি গোঁসাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। কী খবর?

আজ্ঞে কালকে স্টেশনে যে সেই কথাটা বলেছিলাম, মনে আছে?

কোন কথাটা?

আমার বিশুকে যদি একটু মেডিকেলে চান্স করে দেন।

মদন টেকো হরি গোঁসাইয়ের মাথার ওপর দিয়ে উদাস চোখে পুবের আকাশের দিকে চেয়ে বলে, কী সুন্দর দেখেছে?

ব্যস্ত হয়ে হরি গোঁসাই বলে, আজ্ঞে কোনটার কথা বলছেন?

এই ভোরবেলাটা।

আজ্ঞে তা আর বলতে! খুব সুন্দর।

এই ভোরবেলায় আপনার মনটা উদাস হয়ে যায় না?

খুব যায়। খুব যায়। আমাদের ওকিটা তো প্রায় গ্রামের মতোই। সেখানে যা একখানা করে ভোর হয় না রোজ, কী বলব দার! মনটাকে একদম বৈরাগী বানিয়ে ছেড়ে দেয়। ফাষ্ট বাস ধরে আসতে আসতে আজও খুব উদাস লাগছিল।

মদন বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, তু দেখুন বিশুরা আমাদের পিছু ছাড়ে না। উদাস হওয়ার ক্ষেপ থাকলেও কেউ আর উদাস হচ্ছি না, বৈরাগীও না।

হরি গোঁসাই মাথা চুলকে বলে, পিসুকথাটা ঠিক বুঝলাম না দাদা। পিসু পোকা না কি?

না, না। পিসু মানে পিছু। বিতর সঙ্গে মিলে যায় বলে পিসু কথাটা বেরিয়ে গেল।

হরি গোঁসাই চিমটিটা ধরল না। গদগদ হয়ে বলল, আপনার পিসু ছাড়লে আমারে চলবে কেন আমরা হচ্ছি এমোরে আনরিকগনাইজড জনসাধারণ। আমার কথাই ধরুন না। সারা জীবনে একজন মাত্র ভি আই পির কাছে কিছুটা ঘেঁষতে পেরেছি। সেই ভি আই পি হলেন আপনি। আত্মীয় স্বজনের কাছে বড় করে আপনার কথা কত বলি। অফিসেও একটু আধটু খা িপাই।

এই পার্কে আমাকে ধরলেন কী করে?

বাসায় গিয়েছিলাম। দিদি বলল, পার্কে এসেছেন।

মদন ধৈর্যশীল লোকটার মুখের দিকে চেয়ে ভোরের স্বচ্ছ হয়ে আসা আলোয় জনসাধারণকেই দেখতে পায়। এই সেই জনসাধারণ যাদের নিয়ে তার বহু কালের কারবার। এই সেই বিশুর বাব যাদের পিছু পিছু একদিন সে ঘুরেছে, আর যারা এখন তার পিছু পিছু ঘোরে।

মদন একটা শ্বাস ফেলে বলে, শীমন্তর কাছে একটা ডায়েরি আছে। তাতে–

তাতে লেখানো হয়ে গেছে। হেঁ হেঁ।

ঠিক আছে, দেখবখন।

দেখবেন। সারা জীবন বড় দুঃখে কষ্টে কেটেছে। বিশুটা যদি ডাক্তার হয় তবে শেষ জীবনটা–

মদন হাসে। বাপদের ছেলেপুলে নিয়ে কত আশাই থাকে! গম্ভীর হয়ে বলে, ও আশা না করাই ভাল।

হরি গোঁসাই হঠাৎ নিভে গেল। মদন উদাস ভাবে চারদিকে চেয়ে হাঁটছে। পিছনে হরি গোঁসাই। বলে, সে কথাটা বশ্য ঠিক।

মদন প্রসঙ্গটা ভুলে গেছে। ভাল মানুষের মতো বলে, কোন কথাটা?

ধন্য আশা কুহকিনী।

ও। হ্যাঁ–

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ! মদন হরি গোঁসাইকে ভুলে গিয়ে উদাস পায়ে হাঁটতে থাকে। এখন আর খুব একটা আনন্দ হচ্ছে না তার। তবে ভালই লাগছে।

পিছন থেকে হরি গোঁসাই গলা খাকারি দিয়ে জানান দিল যে, সে আছে।

দাদার সঙ্গে যে আজ বড় শ্রীমন্ত নেই!

পাখিরা অনেকক্ষণ বাসা ছেড়েছে। এখন ঝোপে ঝাড়ে চিড়িক মিড়িক করে ঘুরছে তারা। সূর্য মসজিদ ছাড়িয়ে উঠে পড়ল প্রায়। কলকাতার সব স্নান কুশ্রীতা প্রকট হল। দেখতে দেখতে মদন আনমনে জিজ্ঞেস করে, কে শ্রীমন্ত?

আপনার বডিগার্ডের কথা বলছিলাম। দিনকাল তো ভাল না। কালকের খবর শুনেছেন তো?

কীসের খবর? মদনের গলায় এখনও অন্যমনস্কতা।

নব হাটি জেল থেকে পালিয়েছে?

মদন এবার সচেতন হয়। কিন্তু ইচ্ছে করেই অন্যমনস্কতার মুখোশটা পরে থেকে বলে, কে নব যটি?

দাদা সব ভুলে গেছেন। নব হটি মানে যে লোকটা নীলুকে খুন করল। আর যার মা এসেছিল কাল আপনার কাছে ছেলের বউয়ের জন্য চাকরি চাইতে।

ও! হ্যাঁ।

এ সময়টায় শ্রীমন্তকে একটু কাছে কাছে রাখবেন। নব লোক ভাল নয়। অবিশ্যি—

মদন উদাস গলায় জিজ্ঞেস করে, অবিশ্যি—

অবিশ্যি নবর এখন আর সেই তেজ নেই নিশ্চয়ই। পুলিশের তাড়া খেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হচ্ছে। এখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা। তবু...

তবু?

তবু সাবধান থাকা ভাল। আমি কি আর একটু সঙ্গে থাকব দাদা?

নব যদি এসময়ে আসে তবে ঠেকাতে পারবেন?

টেকো হরি গোঁসাই অপ্রতিভ হেসে বলে, আরে আমি ওসব লাইনের লোক তো নই। তবে চেঁচাতে পারব। খুব চেঁচাব–

পারবেন। তবে একটু চেঁচিয়ে শোন তো! দেখি কেমন পারেন।

লজ্জা পেয়ে হরি গোঁসাই বলে, দাদা কী যে বলেন!

তা হলে কী করে বুঝব যে, চেঁচাতে পারেন?

হরি গোঁসাই মাথা নিচু করে লজ্জার গলায় বলে, পারি কিন্তু।

দেখি কেমন পারেন। চেঁচান, খুব জোরে চেঁচিয়ে বলুন, নব আসছে! ওই নব আসছে! খুন, খুন, খুন করে ফেললে! চেঁচান, চেঁচান।–বলে মদন এক পা পিছিয়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগল হরি গোঁসাইকে।

হরি গোঁসাই বলল, তা হলে বিশুর মেডিকেলে ভর্তি ব্যাপারটা হবে তো!

হবে, হবে। ওর বাপ হবে। নইলে কি আর বিশু আমার পিসু ছাড়বে? এখন চেঁচান দেখি!

হরি গোঁসাই থমকে দাঁড়িয়ে গেল! চোখ বুজে মাথায় আর বুকে বার কয়েক হাত ঠেকিয়ে কোনও দেব-দেবীকে প্রণাম করে নিল। তারপর বুক ভরে দম নিয়ে হঠাৎ আকাশ-ফাটানো গলায় চেঁচাতে লাগল, নব আসছে! ওই নব আসছে! খুন, খুন করে ফেললে-এ- এ- এ- এ- এ

মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কাক ডাকতে লাগল, পাখিরা ঝোপ ছেড়ে প্রাণভয়ে উড়ল, প্রাতঃভ্রমণকারীরা সটাসট দৌড়ে গিয়ে রেলিং টপকাতে লাগল,

সামনের এক বাড়িতে দড়াম করে জানালা বন্ধ হয়ে গেল। হরি গোঁসাইয়ের যে এত আওয়াজ তা দেখলে বোঝাই যায় না।

মদন অবাক হয়ে বলল, বাঃ। আপনার গলা তো অ্যাসেট।

বিনীত হাসি হেসে হরি গোঁসাই বলে, আজ্ঞে খুব জোর আওয়াজ হয়। একবার ভিড়ের ট্রেনে শুধু চেঁচিয়ে জায়গা করে নিয়েছিলাম।

হু। মদন গম্ভীর হয়ে বলে।

আর কি চেঁচাতে হবে দাদা?

মদন মাথা নেড়ে বলে, না। এখন তাড়াতাড়ি সরে পড়া দরকার। যা চেঁচিয়েছেন।

আমি তা হলে আসি?

আসুন। একটু পা চালিয়েই আসুন গিয়ে।

বিশুর তা হলে?

পিস পিসু থাকবে।

বলে মদনও একটু পা চালিযেই পার্ক থেকে বেরিয়ে আসে। কারণ, প্রথম ভয়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে ব্যাপারটা কী তা দেখতে। মদনকে একজন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে দাদা? খুন নাকি? মদন এমনভাবে মাথা নাড়ল যাতে হা'ও হয়, নাও হয়।

একটু বাদে যখন সে জামাইবাবুর মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছিল তখন আর তার মুখে উদাসীনতা ছিলনা। জামাইবাবু মণীশ অখণ্ড মনোোেযোগে খবরের কাগজ পড়ছে।

জামাইবাবু।

বলো ব্রাদার।

আপনার চেয়ে খবরের কাগজটা দেখা আমার বেশি দরকার। এবার ছাড়ুন।

তুমি তো এখন পায়খানায় যাবে।

তা গেলেই বা খবরের কাগজ নিয়ে যাব।

যেয়ো। তার আগে যতটা পারি দেখে দিচ্ছি। তোমার ওটা ভারী ব্যাড হ্যাবিট।

কোনটা? খবরের কাগজ পড়াটা?

না, এই খবরের কাগজ নিয়ে পায়খানায় যাওয়াটা।

ব্যাড হ্যাবিট কেন হবে? আমি বরাবর যাই। খবরের কাগজ না হলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

দো ইউ আর অ্যান এম পি এবং তোমার সময়ও কম, তবু বলি এটা খুবই ব্যাড হ্যাবিট।

তা হোক। এবার ছাড়ুন।

ছাড়ছি। চা-টা খাও না।

চা ফিনিশ।

তবে চিরু না হয় আর এক কাপ করে দিক। ও চিরু! শুনেছ।

কী অত মন দিয়ে পড়ছেন?

পড়ার কিছু নেই ব্রাদার। সব ছাতমাথায় ভর্তি কাগজ। সেই ছাতমাথাই দেখছি।

আমার প্রেস কনফারেন্সটা দিয়েছে?

দিয়েছে একটুখানি। পাঁচের পাতার তলার দিকে।

হেডিং কী করেছে?

মালদহের অবস্থা ভয়াবহ। তারপর কোলন দিয়ে তোমার নাম।

দুর! পলিটিক্যাল ব্যাপারগুলো দেয়নি তা হলো আপনি যে কেন এত কিপটে!

কেন বলল তো! ত্রিশ টাকা কিলোর চা খাওয়াচ্ছি।

লোকে আরও দামি চা আমাকে খাওয়ায়। চায়ের খোটা দেবেন না। বলছি, মোটে একটা খবরের কাগজ রাখেন কেন?

একটাই পড়ার সময় পাই না।

তা ছাড়া সেই একটাও আবার বাংলা। বাংলা কাগজে খবর কম থাকে জানেন না?

তোমার দিদিও একটু পড়ে যে। ও তো ইংরিজি বোঝে না।

এবার থেকে দুটো করে রাখবেন। ইংরিজিটার দাম আমি প্রতি মাসে মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেব।

এম পি-দের প্রতিশ্রুতির দাম নেই, সবাই জানে। রিস্ক নেওয়াটা কি ঠিক হবে?

চিবু চা নিয়ে এসে মণীশের দিকে চেয়ে বলে, বড় গলায় চায়ের হুকুম দেওয়ার দরকার ছিল না। আমি তো চা করছিলামই।

মণীশ এক গাল হেসে বলে, তা জানতাম। তবু শালার কাছে নিজেকে উদার প্রমাণ করার জন্যই ওটুকু করতে হল।

মদন মুখ গম্ভীর করে বলে, এই বয়সে আর কি নতুন করে আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টাতে পারবেন? আমি যে প্রথম থেকে জানি আপনি ক্রনিক মাইজার।

অথচ দেখো পাড়াপ্রতিবেশিরা সবাই আলোচনা করে, মণীশবাবু টাকা জমাতে জানেন না। কেবল খরচ করেন, কাছা খুলে খরচ করেন।

আপনার পাড়াপ্রতিবেশীরা স্বপ্ন দেখে। এবার খবরের কাগজটা ছাড়ুন।

বড় জ্বালাচ্ছ হে। যাও না, বাইরের ঘরে সেই কাকভোরে এসে সব বসে আছে, গিয়ে তাদের। সঙ্গে দুটো কথা বলে এসো না। ততক্ষণে...

ওরা বসে থাকার জন্যই এসেছে। তাড়া নেই।

তোমরা লিডাররা বাপু বড্ড গেরামভারি।

আমি গেরামভারি?

নয়তো কী? লোকেরা বশংবদ হয়ে বসে থাকে, আর তোমরা পায়খানায় বসে খবরের কাগজ পড়ো।

লিডারদের নিয়মই তাই।

এই নাও ব্রাদার! বলে মণীশ খবরের কাগজটা ভাঁজ করে এগিয়ে দেয়, যতক্ষণ না দিচ্ছি ততক্ষণ শান্তিতে চা-টুকু খেতে পারব না।

মদন খবরের কাগজটা খুলতে খুলতে বলে, জামাইবাবু।

উ।

আমি যদি মরে যাই তা হলে কী হবে বলুন তো?

কেউ বিধবা হবে না।

আর কী হবে?

আমার টেলিফোনটাও হবে না।

আঃ, কী হবে না তা জিজ্ঞেস করিনি। কী হবে তাই জানতে চাইছি।

আসলে তুমি মরবে না।

কী করে বুঝলেন?

তোমারই বা মরার কথা মনে হচ্ছে কেন? কোনওকালে তো এসব বলোনি! আমরা জানি তুমি হচ্ছে পজিটিভ লোক। এম পিরা এমনিতেই একটু বেশিরকম আশাবাদী হয়। আজহঠাৎ তোমার হল কী?

মদন খবরের কাগজটা খুলতে খুলতে মৃদু হেসে বলে, মৃত্যুর একটা রোমান্টিক দিক আছে, তাই আজকাল মাঝে মাঝে ভাবি মরলে কেমন হয়?

কিছুই হয় না হে।–মণীশ মাথা নাড়ে, মরার মধ্যে রোমান্টিক কিছু নেই, মহৎ কিছু নেই। একেবারে মোটা দাগের ক্যাবলা একটা ব্যাপার। আমাদের দেশে গবা পাগলা বলে একটা লোক ছিল। সে গাইত, মনু রে, বাপের খবর রাখলা না, হ্যায় যে মইরা ভ্যাটকাইয়া রইছে পাছায় পড়ছেজোছনা।

অশ্লীল! অশ্লীল!

মোটেই নয়।–মণীশ মাথা নাড়ে, একদম অশ্লীল নয়। পাছায় জোছনা পড়ার ব্যাপারটা বরং খুবই করুণ। মরা-টরার কথা হলেই আমার গানটা মনে পড়ে।

আপনি যা একখানা জিনিস না জামাইবাবু!

মণীশ উঠতে উঠতে বলে, তুমি পেপার দেখো, আমি বরং ততক্ষণে বাথরুমের দখল নিই গে। তুমি পত্রিকা হাতে ঢুকলে তো পাক্কা দেড় ঘণ্টা।

মণীশ বাথরুমে গেলে কিছুক্ষণ একা বসে আপন মনে ফুটুক ফুড়ক করে হাসল মদন। দিনটা আজ ভালই যাবে। সকালে একটা চেঁচামেচি শুনেছে। বউনিটা ভালই বলতে হবে। তারপর এই জোছনার ব্যাপারটা। দুপুরে আজ রাইটার্সে দু'জন মিনিস্টারের সঙ্গে মিটিং আছে। তখন যদি কথাটা মনে পড়ে যায় তা হলে ঠিক ফুড়ক করে হেসে ফেলবে সে। বিকেলে আছে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। তখনও কি মনে পড়বে?

পত্রিকায় কয়েদি পালানোর কোনও খবর নেই। বাংলা কাগজে এমনিতেই খবর কম থাকে, তার ওপর এসব খবরের এমনিতেই তেমন গুরুত্ব নেই। তবে যারা নবকে জানে তারাই বুঝবে খবরটা কতখানি গুরুতর।

বাইরের ঘর থেকে পরদা সরিয়ে ভিতরের বারান্দায় উকি দিল শ্রীমন্ত, দাদা, আপনার বন্ধু এসেছে।

আমি জগবন্ধু। কে এসেছে? নামটা কী?

মাধব হাজরা। ওই যে গোলপার্কের কাছে

আর বলতে হবে না। মাধব দুনিয়ায় একটাই হয়। আসতে বলো।

মাধব বোধহয় বাইরের ঘরে ফিতে বাঁধা জুতো খুলতে খানিক সময় নিল। তারপর ভিতরের বারান্দায় আসতেই তার মুখে উদভ্রান্তিটা প্রথম লক্ষ করে মদন।

তবু মদন সব সময়ে নিজে খোশ থাকতে এবং অন্যকে খোশ রাখতে চেষ্টা করে। হালকা গলায় বলল, মুরগা পেয়েছিস?

কীসের মুরগা?

তোর বাসায় আজ রাতে একটা আস্ত এম পি-র নেমন্তন্ন যে।

ওঃ! আচ্ছা, মুরগি হবে। কিন্তু খবর শুনেছিস?

খবর শোনাই আমার কাজ। নব হাটি পালিয়েছে, এই খবর তো? তা অত ঘাবড়ানোর কী আছে? বোস।

মণীশের পরিত্যক্ত চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে মাধব। তারপর হাঁফ ধরা গলায় বলে, এটা ইয়ারকির ব্যাপার নয়।

এ কথায় সকালের হাসিখুশি ভাবটা মদনের মুখ থেকে মুছে গেল বটে, কিন্তু তার মুখে কোনও ভয় বা ভাবনা ফুটল না। মুখটা আস্তে আস্তে গম্ভীর ও নিষ্ঠুর হয়ে গেল। সে শুধু বলল, হুঁ।

মাধবের চেহারাখানা সুন্দর। দারুণ ফরসা, জোড়া, খুব লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান। সুন্দর ছেলেদের সুন্দর বউ জোটে না, সুন্দর মেয়েদের জোটে না সুন্দর বর। মাধবের বউ ঝিনুক কিন্তু সুন্দর। দু'জনেই সুন্দর, দু'জনের সংসার সুন্দর, ফ্ল্যাট সুন্দর। কিন্তু তবুও কোথায় যে ওদের খিচ তা আজও মদন বুঝতে পারল না।

মাধবের চেহারায় আজ তেমন জলুস নেই। সকালে দাড়ি কামায়নি, লম্বা চুলগুলো পাট করা নেই, মুখে বেশ উত্তেজিত ভাব, উৎকণ্ঠা। ডান হাতের মধ্যমায় গোমেদের আংটিটা বারবার ব্যস্ত আঙুলে ঘোরাচ্ছে। বলল, ইউ মাস্ট ডু সামথিং।

মদন ধীরে-সুস্থে কাগজের শেষ পাতাটা উলটে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, চা খাবি?

চা!—যেন প্রস্তাবটায় কিছু অস্বাভাবিকতা আছে এমনভাবে বিস্ময় প্রকাশ করল মাধব। তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল, হ্যাঁ খাব। দিদি কই?

ঘরে। ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি করে দিচ্ছে।

মাধব কিছুক্ষণ চুপ করে বসে একবার আংটি ঘোরায়, একবার চুলে আঙুল চালায়। হঠাৎ একটু ঝুঁকে বলল, পেপারে কিছু দিয়েছে?

মদন চোখ তুলে বলে, কী দেবে?

নবর ব্যাপারটা?

মদন মাথা নেড়ে পত্রিকাটা ভাঁজ করে রেখে দিয়ে বলে, একজন তৃতীয় শ্রেণির কয়েদির পালানোর খবর তেমন কিছু গুরুতর নয়।

মাধব পিছন দিকে হেলে বসে কয়েক পলক চোখ বুজে থাকে। তারপর বলে, তা বটে। বাট ইট ইজ এ সিরিয়াস নিউজ ফর আস।

মদন মৃদু স্বরে বলে, আস নয়, বল মি। তুইই ভয় খেয়েছিস, আমি নয়।

মাধব চোখ খুলে মদনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে, তোকে কি নব স্পেয়ার করবে?

মদন মৃদু হেসে বলে, তার চেয়ে বরং জিজ্ঞেস করা ভাল, হোয়েদার আই উইল স্পেয়ার হিম।

মাধবের স্বাভাবিক চোখা চালাক ভাবটা আজ ছুটি নিয়েছে। তবু সে বলল, আমি তোর মতো হিরো নই। অ্যান্টিহিরো।

মদনের মুখে কথা ফুটল না। কিন্তু চাপা নিষ্ঠুরতাটা জ্বলজ্বল করতে লাগল। মাধব জানে, মদনের মধ্যে একটা কিছু আছে। কিন্তু সেটা কী তা এত বছরেও বুঝতে পারল না। ছেলেবেলায় আসানসোলে কলিয়ারির এলাকায় তারা একসঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। লোকে বলত, মদনমাধব। এত গলাগলি ছিল, তবু মদনের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত একস্ট্রা ফাউ

জিনিসটার জোরেই না ব্যাটা এম পি। আর সেই ফাউ জিনিসটা যা মাধবের নেই, সেটা এখন মদনের মুখে চোখে ঢেউ দিচ্ছে।

মাধব তার খড়খড়ে দাড়িওলা গাল চুলকোল। তারপর একটু মিয়োনো গলায় বলল, তুই কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নব জেল ভেঙে পালাল, এর মধ্যে একটু অদ্ভুত যোগাযোগআছে না? ব্যাপারটা ভেবে দেখেছিস?

মদন মাথা নাড়ে, না। অত ভাববার সময় নেই। ভেবে লাভও নেই। গোটা দুই মুরগা কিনে নিয়ে বাড়ি যা। ঝিনুককে ভাল করে রাঁধতে বলিস।

ঝিনুক গত বছর পাঁচেক রান্নাবান্না করেনি।

বলিস কী?

ঝিনুক না রাঁধলেও আমরা না খেয়ে থাকি না। রান্নার লোক আছে, চিন্তা নেই।

তবে মুরগা কিনে বাড়ি যা। একটু বেশি করে বান্না করতে বলিস। আমি তোদের না জানিয়েই। বৈশম্পায়নকেও নেমন্তন্ন করে দিয়েছি।

বৈশম্পায়ন! বলে একটু হাসে মাধব, কিন্তু কোনও মন্তব্য করে না।

মদন অবশ্য তীক্ষ্ণ চোখে হাসিটা দেখল। বলল, হাসলি কেন? এনিথিং রং?

না, নাথিং রং!

ওকে নেমন্তন্ন করায় তোরা অসুবিধেয় পড়বি না তো!

মাধব মাথা নেড়ে বলে, অসুবিধে তো তোকে নিয়ে! ঝিনুক বলে দিয়েছে ড্রিংক করলে বাড়ি থাকবে না।

হোঃ হোঃ করে হাসে মদন। তারপর গলা নামিয়ে বলে, ড্রিংকস কি বাদ যাচ্ছে নাকি?

না। তবে ছোট করে হবে।

ঝিনুক বাড়ি থাকবে?

মাধব এবার খুব অদ্ভুত ধরনের একটা হাসি হেসে বলে, বোধহয় থাকবে। বৈশম্পায়ন আসছে জানলে থাকবেই মনে হয়।

তীক্ষ্ণধার চোখে মাধবের মুখটা দেখে নিচ্ছিল মদন। ঝুঁকে আস্তে করে বলল, ইজ দেয়ার এনি অ্যাফেয়ার?

সিরিয়াস কিছু নয়। দু'জনেই দুজনের প্রতি একটু সফট। ব্যাপারটা আমি খুব এনজয় করি।

মদন হতাশার গলায় বলে, তোরা একেবারে হোপললস। বউ অন্যের সঙ্গে প্রেম করলেও সেটা তোরা এনজয় করিস কী করে?

আস্তে মদনা, আস্তে।–মাধব গলা আর-এক পরদা নামিয়ে বলে, দুনিয়াটাই তো রঙ্গশালা। কে কার বউ? কে কার প্রেমিকা? আমি পজেসিভ নেচারের লোক নই। আমি শুধু দেখি, শেষযৌবনা এক মহিলা মধ্যবয়স্ক একজনের প্রেমে পড়ে কেমন বয়ঃসন্ধির ছুকরি হয়ে যাচ্ছে। ঘ্যাম নাটক মাইরি।

সেই নাটকে তোর ভূমিকা কী? পরদা টানা?

না। আমার ভূমিকা ছিল ভিলেনের। কিন্তু আমি মাইরি ফিলজফার হয়ে গেছি। তবে রেফারির মতো নজরও রাখছি। বাড়াবাড়ি দেখলেই ফাউল বা অফসাইড বলে চেঁচিয়ে বাঁশি বাজাব।

এই সময়ে শোওয়ার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে চিরু আসে। মাধবের দিকে চেয়ে বলে, বন্ধু এসেছে বলে তোর টিকি দেখা গেল। নইলে দিদি মরল কি বাঁচল সে খবরও তো নিস না।

মাধব এক গাল হেসে বলে, তোমার মরার কী? দিব্যি গায়ে-গতরে হয়েছ।

মোটা হয়েছি বলছিস?

মোটা নয়, মোটা নয়। পরিপূর্ণ হয়েছ।

ফাজিল। চা খাবি?

মদন একটু ধমক দিয়ে বলে, আরে তুই দুনিয়াসুদ্ধ লোককে চা খাওয়াতে গিয়ে যে পতিদেবতাটিকে ভাত খাইয়ে অফিসে পাঠাতে পারবি না।

না। না খেয়ে যাবে না, ডাল ভাত নেমে গেছে। সেই ভোর রাতে তুই যখন বেরলি তখনই উঠে সব সেরে ফেলেছি।

মাধব একটা শ্বাস ফেলে বলে, তা হলে চিরুদি, গরিব ভাইকে একটু চা খাওয়াও।

তুই গরিব? কেয়াতলায় ফ্ল্যাট কিনেছিস, তুই যদি গরিব তো আমরা কী?

তোমরা সবাই শুধু আমার ফ্ল্যাটটাই দেখলে! আর আমি যে দিনকে-দিন শুকিয়ে যাচ্ছি।

তুই আবার শুকোলি কোথায়?—চিরু অবাক হয়ে বলে, বেশ তো চেহারাটা দেখাচ্ছে। একটু এলোমেলো অবশ্য। রাতে ঘুমোসনি নাকি?

না, সেসব নয়। মাঞ্জা দেওয়ার সময় পাইনি।

ঝিনুক কেমন? বেশি মোটা হয়ে যায়নি তো?

না, না। রেগুলার যোগাসন করে, কম খায়, সারাদিন শরীরের যত্ন করে, কাজকর্ম নেই, মোটা হবে কেন? ভাল আছে।

বউয়ের কথা উঠলেই তোরা অমন বেঁকিয়ে কথা বলিস কেন বল তো? বউগুলো কি মানুষ নয় নাকি?

বেঁকিয়ে বললাম কোথায়?—মাধব অবাক হওয়ার ভান করে।

ওই যে বললি, সারাদিন শরীরের যত্ন করে, কাজ করে না, আরও সব কী যেন।

তোমার মনটাই বাঁকা। একজন মহিলা নিজের শরীরের যত্ন নেয় এটা তো প্রশংসার কথাই। তুমি যে নাও না, তার জন্য আড়ালে আমরা তোমার নিন্দে করি।

চিরু হেসে ফেলে বলে, ইয়ারবাজ। বোস, চা করি আনি।

হ্যাঁ, যাও। রান্নাঘর ছাড়া তোমাকে কোথাও মানায় না।

সেটা তোর জামাইবাবুও খুব ভাল বুঝেছে।

এতক্ষণ মদন একটাও কথা বলেনি। কোনও কথা তার কানেও যায়নি। নিজের নখগুলোর দিকে চেয়ে ভ্রু কুঁচকে কী যেন ভাবছিল।

মণীশ বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল, যাও ব্রাদার, খবরের কাগজ নিয়ে আধবেলার জন্য ঢুকে পড়ো।

কোঁচকানো সটান হল, একটু হেসে মদন বলে, অত সময় যদি হাতে থাকত জামাইবাবু। এক্ষুনি রাইটার্সে যেতে হবে।

মণীশ মাধবকে দেখে খুশি হয়ে বলে, এই যে ব্রাদার! মদন না এলে মাধবের দেখা পাওয়া যায় না, আমাদের হয়েছে বিপদ। তোমার ফোন নম্বরটা চিরুকে দিয়ে যেয়ো তো।

যাব, কিন্তু আপনি জন্মেও ফোন করবেন না, জানি।

আহা, কখন কী দরকার হয় তার কি ঠিক আছে? তবে পয়সা দিয়ে করতে একটু গায়ে লাগে আজকাল। ফোনের চার্জ যা বেড়েছে।

কেন, অফিস থেকে করবেন!

মণীশ ম্লান একটু হাসে, অফিস থেকে। অফিস থেকে প্রাইভেট ফোন করতে একটু কিন্তু কিন্তু লাগে।

মদন মাথা নেড়ে মাধবকে বলে, জামাইবাবু একটা হোপলেস কেস, বুঝলি মাধব? হি ইজ হেলপলেসলি অনেস্ট। এ রোগের চিকিৎসা নেই।

মাধব হা করে একটু চেয়ে থেকে বলল, জামাইবাবুর অনেস্টি সম্পর্কে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা যে শুচিবায়ু হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

মণীশ খুব দুর্বলভাবে একটু হাসে।

.

০৮.

তুই ভয় পেয়েছিস?—মদন জিজ্ঞেস করে।

শ্রীমন্তর মুখ করুণ গম্ভীর। কোনও বিপদ বা ঝামেলা পাকালে শ্রীমন্তর মুখ ওইরকম হয়ে যায়। তাকাতে ভয় করে। সে মদনের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলে, না। তবে কেয়ারফুল থাকা ভাল।

মদন আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল। বলল, তা থাক। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

শ্রীমন্ত মুখে কিছু বলল না। তবে মনে মনে বোধহয় মদনকে একটা খিস্তি দিল। তার কারণ নব জেল থেকে বেরিয়েও মদনের নাগাল পাবে না। তার আগেই চিড়িয়া ভেগে যাবে দিল্লি। তারপর বিদেশে। কলকাতার ঘুণচক্করে নবর পাল্লা টানতে পড়ে থাকবে শ্রীমন্ত আর তার সাকরেদরা। কাজটা খুব সহজ নয়। যারা নবকে চেনে তারাই জানে।

কথা হচ্ছিল একটা অ্যামবাসাড়ার গাড়িতে বসে। সকালবেলা। গাড়ি যাদবপুর পেরিয়ে বাঘাযতীনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। সেই বোড়াল।

দিল্লিতে আমার জন্য একটা চেষ্টা করবে বলেছিলে মদনদা।

হবে।–মদন অন্যমনস্ক ভাবে বলে, এখানেও তো বেশ আছিস!

একে থাকা বললা! ভদ্রলোকের মতো থাকতে গেলে কলকাতায় কিছু হবে না। দিল্লিতে একটা ব্যবস্থা করে দাও।

কী করবি?

যা হোক। একটা দোকান, না হয় বাস বা ট্যাক্সির পারমিট।

ওখানে পারবি না। শক্ত কাজ। তবু যদি যেতে চাস তো চেষ্টা করব।

করো।

তুই একটু ভয় খেয়েছিস শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত জানে, মদনদা এই যে দিল্লি যাবে, গিয়েই ভুলে মেরে দেবে তার কথা। ভি আই পি-রা সব একরকম। মদনের ওপর নানা কারণেই একটু চটে আছে সো লোকটা কথা দিয়ে কথা রাখে না। তার ওপর ভয়ের খোঁটা দেওয়া হচ্ছে। শ্রীমন্ত ঠান্ডা গলাতেই পালটি দিল, ভয় একটু তুমিও খেয়েছ মদনদা। নইলে এই সাতসকালে জরুরি কাজ ফেলে বোড়াল রওনা হতে না।

মদন হাসে। একটু অপ্রতিভ বোধ করে না। বলে, কাল নবর মাকে কথা দিয়েছিলাম। কানোয়ারকে সকালে ফোন করতেই রাজি হয়ে গেল। খবরটা দিয়ে আসা কি খারাপ?

খারাপ বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, নবর মাকে তুমি কাটিয়ে দেওয়ার জন্য ওকথা বলেছ।

মদন একটু চুপ করে থেকে বলে, শত হলেও এক সময়ে নব আমার জন্য অনেক করেছে।

শ্রীমন্ত কথা বাড়াল না। কিছুদিন যাবৎ মদনদার সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না এটা সে নিজেই টের পাচ্ছে। মদনদাও কি আর টের পাচ্ছে না?

মদন একটা সিনেমা হলের হোর্ডিং দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে। মুখ ফিরিয়ে বলল, এ কথাটা যেন চাপা থাকে।

নবর বউয়ের চাকরি তো? ও নিয়ে ভেবো না।

দিল্লি সত্যিই যেতে চাস?

চাই। কলকাতায় কী হবে বলল। হুজ্জতি করা আমার রক্তে নেই। ওসব মেলা হয়েছে। এইবার সেটল করতে চাই।

তুই বি কম পাশ না?

টুকে মুকে। ওসব বিদ্যে ধোররা না। ধ্যাড়াব!

না, তোকে দিয়ে চাকরি হবে না সে আমি জানি!

চাকরিটাও রক্তে নেই কিনা। আমার বাপ পুরুত ছিল। মেলা যজমান। আমিও নাকি অনেকের কুলগুরু। রাস্তাঘাটে মাঝে মাঝে বেশ বুড়ো বয়স্ক মানুষও দুম করে পেন্নাম ঠুকে দেয়। কতক বাড়ি আছে যেখানে গেলে আমার জামাই আদর।

মদন হাসে, লাইনটা তো ভালই।

হ্যাঁ, ভাল না হলে আমার বাবা চিরকাল ও কাজ করবে কেন? চাকরি আমাদের বংশে কম লোকই করেছে।

নিষ্ঠাবান বামুনের ছেলে হয়ে তুই খুনখারাপি করিস কী করে?

মাইরি মদনদা, ঠুকো না। খুনখারাপি আমার সয় না। একটু হাঁকডাকের লোক ছিলাম বটে বরাবর। কিন্তু এতটা হয়ে যাব ভাবিনি।

মদন শ্রীমন্তর হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বলল, তুই একটু নরম আছিস।

আছি মদনদা। স্বীকার করছি।

নবর মতো তুই কেঠো মানুষ নোস।

তাও নই।

নবর সঙ্গে যদি পাল্লা টানতে হয়, পারবি?

শ্রীমন্ত একগাল হাসে, পারব। তাতে আটকাবে না। তবে আমি ওর মতো নীচে নামতে পারি না। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তো?

পারছি। আমার লোক নিয়েই কারবার। তোর মুশকিল হল, তুই যে ভদ্রলোক তা ভুলতে পারিস না। আর, কিছু লোক যে তোকে দেখলে প্রণাম করে সেটাও ততাকে কাছা ধরে টানে মাঝে মাঝে।

শ্রীমন্ত হাসল। বলল, সবই তো বোঝো দাদা।

আমি তোরটা বুঝি। কিন্তু তুই আমারটা বুঝিস না।

কেন বলছ ওকথা?

এই যে বললি, ভয় পেয়েছি বলেই নাকি আমি নবর বউয়ের চাকরি করে দিচ্ছি।

ওটা একটা ফালতু কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মদন চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে শ্রীমন্তরও বুকটা একটু গুড় গুড় করে ওঠে। তার গায়ে জোর আছে, পকেটে লোডেড রিভলভার আছে, সাহসও আছে, তবু সে জানে মদনদার মতো লোক তার মতো হাজারজনাকে নাচিয়ে বেড়াতে পারে। বে-খেয়ালে বেচাল বলে ফেলেছে।

শ্রীমন্ত একটু চুপ করে থেকে বলল, মদনদা, রেগে আছ মাইরি?

মদন জবাব দিল না। ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

বোড়ালে বড় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে মদন নামল। শ্রীমন্ত নামতে যাচ্ছিল, মদন হাত তুলে বলে, না। তুই থাক।

শ্রীমন্ত অবাক হয়ে বলল, একা যাবে?

একাই যেতে হবে।

তোমার কাছে আর্মস নেই!

তাতে কী? আমি কোনওকালে আর্মস নিয়ে চলি না। ভয় নেই, আর্মস ছাড়াও আমার অন্য কিছু আছে সেটা তুই বুঝবি না।

কাজটা ঠিক করছ না মদনদা। নব এখন ফ্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাড়িতে একবার ঢুঁ দেবেই।

দুর বোকা!নব তোর চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। ও জানে,পুলিশ ওর বাড়ির চারদিকে জাল পেতে আছে।

তা অবশ্য ঠিক।

শ্রীমন্ত মাথা চুলকায়। একটু কেমন লাগে শ্রীমন্তর। মদনদা তাকে সঙ্গে নিচ্ছে না। মদনদা গম্ভীর। কোথাও একটা তাল কেটে যাচ্ছে।

ভয় নেই।বলে মদন একটা ভাঙাচোরা মেটে রাস্তা ধরে এগোতে থাকে।

এদিকে অনেক নিবিড় গাছপালা, পুকুর, কঁকা জমি। একেবারেই হদ্দ গ্রাম। বেশির ভাগ নিম্নমধ্যবিত্তদের বাস বলে বাড়িঘরগুলোর তেমন বাহায় নেই। ম্যাড়ম্যাড়ে, শ্রীহীন। মদনের খুব খারাপ লাগছিল না। সে একবার ঘুড়ি দেখল। প্রায় এগারোটা। বেলা একটায় রাইটাসে মিটিং। সময় আছে। তবু সে একটু পা চালিয়ে হাঁটে।

আধ মাইলের মতো হেঁটে একটা শ্রীহীন, ভারী গরিব চেহারার চালাঘরের সামনে উঠোনে পা দেয় মদন। নব টাকা কামাই করেছিল মন্দ নয়, কিন্তু ঘর-সংসারের পিছনে কিছুই ঢালেনি। কেবল অন্য সব ফুর্তিতে উড়িয়ে দিয়েছে। এই কাঠা তিনেক জমিও ওকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়নি। ঝোপজঙ্গলে ভরা এই তিন কাঠা এক মুসলমানকে ভোগা দিয়ে দখল করেছিল সে। সেই জমি আর চালাঘরটাই এখন নবর আত্মীয়দের একমাত্র আশ্রয়।

মদন উঠোনে পা দিয়ে একবার ফিরে চাইল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা ঘাড়েগদানে চেহারার লোক তাকে দেখছে। গায়ে হাফ-হাতা নীল রঙা একটা শার্ট, পরনে ময়লা ধুতি। সাদা পোশাকের পুলিশকে চিনতে এক লহমাও লাগে না মদনের। সে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। তারপর অনুচ্চ স্বরে ডাকে, গৌরী! গৌরী!

এত ভদ্র গলায় বোধহয় বহুকাল কেউ গৌরীকে ডাকেনি। খোলা দরজায় গৌরী এসে অবাক চোখে তাকায়।

গৌরী ফরসা নয়। তবে ভারী মিঠে মোলায়েম একটা শ্যামলা রং ছিল তার। ছিল অফুরন্ত স্বাস্থ্যের শরীর। ছিল অকূল দু'খানা চোখ। মুখে উপচে পড়ত শ্রী।

এখন তার কিছুই প্রায় নেই। শরীর শুকিয়ে অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। রং কালো হয়ে গেছে। এখনও শুধু চোখ দুখানা আছে। তাকালে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে আজও।

আমি মদনদা। চিনতে পারছ?

গৌরীর শুকনো হাড্ডিসার মুখে একটু হাসি ফুটল। খুব অবিশ্বাসের হাসি। প্রথমটায় বুঝি কথা সরল না। তারপর মৃদু লাজুক স্বরে বলল, এলেন তা হলে! আসুন।

বেশিক্ষণ বসার সময় নেই।

গৌরী হারিয়ে গিয়েছিল, এই কথায় হঠাৎ যেন ঝলসে উঠল পুরনো গৌরী। বলল, একটু বসে না গেলে লোককে কী করে বিশ্বাস করাব যে, একজন এম পি আমাদের বাড়িতে এসেছিল?

মদন মৃদু হেসে নামমাত্র দাওয়ায় উঠে চটি ছেড়ে রাখে। বলে, ঘরে নয়। এইখানেই একটা মাদুর-টাদুর পেতে দাও।

গৌরী বলে, না। এখানে আব্রু নেই। ঘরে আসুন। গরম লাগবে একটু, তা আমি পাখার বাতাস দেব' খন।

অগত্যা মদন ঘরে ঢোকে। যেমনটি আশা করা যায়, ঘরটি ঠিক তেমনিই। বেড়ার গায়ে গুটি তিনেক ছোট জানলা বসান। রোদে তাতা টিনের গরমে ভেপসে আছে ভিতরটা। দু ধারে দুটো সস্তা চৌকিতে অত্যন্ত নোংরা বিছানা। কয়েকটা ফুটপাথে কেনা র্যাকে রাজ্যের কৌটো-টোটো রাখা। তবে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো আছে, লক্ষ করে মদন।

তোমার শাশুড়ি কই?

উনি একটা বিড়ির কারখানায় যান।

ছেলেমেয়ে?

গৌরী একটা শ্বাস ফেলে বলে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে।

লেখাপড়া করে না?

নাম লেখানো আছে ইস্কুলে। যায় বলে তো মনে হয় না।

দু'জন। বড়টা ছেলে। ছোটটা মেয়ে। তোমার কটি?

গৌরীর হাতপাখাটা নড়বড়ে। মচাৎ মচাৎ শব্দ হচ্ছে। মদন বলল, থাক গে। পাখা রেখে দাও।

গৌরী রাখল না। বলল, কেমন আছেন?

ভাল নেই গৌরী।

আপনি ভাল নেই? তবে আমরা কোথায় যাব!

তোমার শাশুড়ি গতকাল আমার কাছে গিয়েছিল।

জানি। আমি বারণ করেছিলাম, শোনেনি।

বারণ করেছিলে কেন?

গৌরী একটু উদাস হয়ে বলে, কী হবে গিয়ে? আমার জীবনে তো আর ভাল কিছু হবে না।

মদন একটু চুপ করে থেকে বলে, তোমার চাকরিটা হয়ে গেছে।

কোথায়?

নবর কারখানায়।

খবরটা শুনে গৌরী গা করল না। বলল, ও।

কারখানায় ওদের অফিসও আছে। সেই অফিসে।

গৌরী জবাব দিল না। হাতপাখার মচাৎ মচাৎ শব্দ হতে লাগল।

মদন একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, নবর কারখানায় কি তুমি চাকরি করতে চাও না?

গৌরী মৃদু স্বরে বলল, এই প্রশ্নটাই আপনার আগে করা উচিত ছিল মদনদা।

মদন বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, কাল তোমার শাশুড়ি গিয়ে নবর কারখানায় তোমাকে একটা চাকরি দেওয়ার কথা বলল, তখনও ভেবে দেখিনি যে, তোমার কাছে চাকরিটা কতখানি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।

গৌরী একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক আপনার বুদ্ধি এখনও লোপ পায়নি দেখছি। একটু দেরিতে হলে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন।

মদন মাথা নেড়ে বলে, বুদ্ধির ধার কমেও যাচ্ছে। আগের চেয়ে মাথা এখন অনেক কম। খেলে।

গৌরী একটু ক্লান্ত স্বরে বলল, নবর মাকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে,ওর কারখানায় আমার কাজ করা বিপজ্জনক। ওর শত্রু অনেক। তার ওপর ওর উল্টো ইউনিয়ন এখন কারখানা দখল করেছে। ওখানে চাকরি করা কি সম্ভব! কিন্তু নবর মা তা মানতে চায় না।

কী বলে?

অনেক কিছু বলে। সব তো আপনাকে বলা যায় না। এমনকী বেশ্যাগিরি করেও টাকা আনতে বলে। আর শুনবেন?

মদন একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর বলে, বুড়ি তার উপযুক্ত কথাই বলে। তাতে উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই।

আমি উত্তেজিত হই না তো!

নবর সঙ্গে কি জেলখানায় মাঝে মাঝে দেখা করতে যাও?

না। ওর মা যায়। ছেলেমেয়েও কখনও-সখনও যায়।

তুমি যাও না কেন?

কেন যাব?

মদন একটু হাসল, রাগটা কি নবর ওপর? না আমার ওপর?

আপনার ওপর রাগ করব! ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন!

ঠাট্টা করছ?

আপনি ঠাট্টা-ইয়ার্কির অতীত হয়ে গেছেন মদনদা।

শোনো, তোমার জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করা খুব শক্ত হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন তো কম করিনি। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে যাই, এখানে আর থেকো না।

গৌরী অবাক হয়ে বলে, থাকব না? কেন?

কারণ আছে! তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?

গৌরী বিহ্বল মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। কোথায় যাব?

বাপের বাড়ি এখনও কি ম্যানেজ হয়নি?

না! কোনওকালে হবেও না।

তাহলে?

আমার যে কোনও জায়গা নেই, সে তো আপনি জানেন!

চিন্তিত মুখে মদন একটা হুঁ দিল। তারপর আরও খানিকক্ষণ ভেবে বলে, দূরে যেতে হলে পারবে?

কোথায়?

ধরো যদি দিল্লি যেতে হয়?

আমার জন্য আপনি এত ভাবছেন কেন? আমি বেশ আছি। এর চেয়ে বেশি বিপদ আর কী হবে?

একটু দ্বিধা করে মদন বলে, কাল নব জেল থেকে পালিয়েছে। জানো?

এতক্ষণ ভাঙা পাখার মচাৎ মচাৎ শব্দে কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল মদনের। এখন হঠাৎ পাখার শব্দটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিস্তব্ধতাটা খুব বড় করে শোনা গেল।

অবশ্য কয়েক সেকেন্ড বাদেই আবার পাখার মচাৎ মচাৎ শব্দ দ্বিগুণ জোরে হতে লাগল। গৌরী বলল, আপনি ঘরে ভীষণ ঘেমে যাচ্ছেন। দাওয়াটাতেও রোদ পড়েছে।

আমার জন্যে ভেবো না। আমি এক্ষুনি চলে যাব। হাতে অনেক কাজ।

সে তো জানি। এত বড় দেশের দণ্ডমুণ্ডের একজন কর্তা তো আপনিও।

তোমার মুখে এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না গৌরী।

কেন মদনদা? আমি কি আলাদা কিছু?

আলাদাই তো ছিলে। এখন কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছ। কেবল কি ঠেস দিয়ে কথা বলতে হয়?

আমার আজকাল স্বাভাবিক কথা আসতে চায় না। মনটা খুব সংকীর্ণ হয়ে গেছে বোধ হয়। হওয়ারই কথা।

না গৌরী, আমাকে দেখলেই তোমার প্রতিহিংসা জেগে ওঠে।

প্রতিহিংসা কেন হবে? কী যে বলেন।-বলে গৌরী হঠাৎ হাতপাখাটা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে কী শুনল, তারপর বলল, নবর মা আসছে।

মদন মৃদু একটু হেসে বলে, বুড়ি খুব খান্ডার না?

গৌরীও হাসে, নবর মা তো, একটু তেজি তো হবেই।

তোমার সঙ্গে খুব লাগে?

গৌরী মাথা নাড়ে, লাগে, তবে একতরফা। আমি জবাব দিই না।

সে কী! মদন অবাক হয়ে বলে, জবাব দাও না কেন? এক সময়ে তো তুমি দারুণ ভাল ঝগড়াটি ছিলে! যাকে তাকে ক্যাট ক্যাট করে কথা শোনাতে।

গৌরী অবসন্ন মুখে বলে, আপনি তো আমার দোষ ছাড়া গুণ কখনও দেখেননি।

হাত নেড়ে মদন বলে, ওসব কথা রাখো। আমি তোমাকে ভাল চিনি। কথা হচ্ছে শাশুড়ির সঙ্গে একটু ঝগড়া-টগড়া করো না কেন? তাতে তো সময়টাও ভাল কাটে।

কী যে বলেন মদনদা।–গৌরী বিরক্ত মুখে জবাব দেয়।

কেন, ঝগড়া কি খারাপ?

সে আপনিই জানেন। আমার ভাল লাগে না।

বুড়ির মুখ কেমন? খুব খারাপ কথা বলে?

গৌরী হেসে ফেলে। বলে, কেমন আবার! আঁস্তাকুড়।

তাহলে তো তোফা।

আপনি আবার ঝগড়া-প্রিয় হলেন কবে থেকে?

আহা, পার্লামেন্টে তো আমরা ঝগড়াই করি। দারুণ ঝগড়া। তবে সেখানে গালাগাল চলে না, পয়েন্টে পয়েন্টে ল্যাঙ্গালেঙ্গি হয়। আমার অবশ্য ওরকম বাবু-ঝগড়া ভাল লাগে না। বহুকাল বস্তিমার্কা ঝগড়া শুনিনি, একটু শোনাবে?

গৌরী ভ্রুকুটি করে তেতো গলায় বলে, আমি কি বস্তির মেয়ে?

আরে না। তুমি আবার ঘুরিয়ে ধরলো আমি নবর মা'র কথা বলছিলাম। একটু খুঁচিয়ে দিলে একেবারে ভাগীরথীর উৎস খুলে যাবে। দাও না একটু খুঁচিয়ে।

গৌরী উদাস হয়ে বলে, আপনি খোঁচান গিয়ে। আমি নিত্যি শুনছি। ওই আসছে। উল্টোদিকের বাড়ির বউয়ের সঙ্গে কথা বলছিল এতক্ষণ। কথা থেমেছে।

বুড়িকে খবরটা দেবে নাকি?

কোন খবর?

নব যে পালিয়েছে।

উদাস মুখে গৌরী বলে, আপনিই দিন।

তুমি এত উদাস ভাব দেখাচ্ছ কেন বলল তো!নবকে খুঁজতে পুলিশ সব দিকে ঘুরছে। এ বাড়িও তাদের নজরবন্দি। নবকে ধরার জন্য দরকার হলে গুলিও চলবে। আমার নিজের ধারণা, নব মরতেও পারে।

তার আমি কী করব?

নব মরলে তুমি বিধবা হবে, জানো না?

খুব জানি। তবে আমার বিধবা হওয়ার আর বাকি কী? বিয়ের দিন থেকেই তো আমি বিধবা।

নবর ওপর তোমার খুব রাগ।

রাগের স্টেজ পার হয়ে গেছে। এখন শুধু ঘেন্না।

তুমি যা পষ্টাপষ্টি কথা বলল। কিন্তু নবর সঙ্গে তো তোমাকে কেউ ঝোলায়নি। তুমি নিজেই ঝুলেছ।

গৌরী একটু থতমত খেয়ে বলে, আমি বুলব কেন? আমি নবকে কোনওকালে চাইনি তো।

মদন গম্ভীর হয়ে বলে, আমি তখন লিডার ছিলাম না গৌরী। এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় একটু-আধটু সোশ্যাল ওয়ার্ক করতাম। নবর মতো ফেরোসাস গুন্ডা বা নীলুর মতো ভাল ওয়ার্কারকে তখন আমার খুব দবকার হত। যদিও আমরা তিনজন ছিলাম তিনরকম, কিন্তু

কাজ করতাম একসঙ্গে। আর একটি জায়গায় আমাদের মিল ছিল। আমরা তিনজনই তোমাকে পছন্দ করতাম।

গৌরীর মুখ সাদা দেখাচ্ছিল।

মদন একটু চোখের ইশারা করে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, বুড়ি কদুর? এল নাকি?

গৌরী মাথা নেড়ে বলে, পুকুরে হাত-পা ধুতে গেছে। এক্ষুনি আসবে।

মদন বলে, হ্যাঁ, আমরা তিনজনই তোমাকে পছন্দ করতাম। তাই না?

নীলুর কথা থাক। তবে আপনারা দু'জন করতেন। মানছি।

কিন্তু তুমি নবকেই দেহ-মন দিয়েছিলে, আমাদের পাত্তা দাওনি।

নবকে আমি মন দিইনি।খুব ক্ষীণ গলায় গৌরী বলল।

শুধু দেহ?

সেটাও ও জোর করে নিত।

আর মনটা? সেটা কাকে দিয়েছিলে? আমাকে, না নীলুকে?

তা জেনে কী হবে? আপনি তো আগে কখনও জানতে চাননি।

তা ঠিক। তবে জানতে চাইতে হবে কেন বলো তো। মন দিলে তো এমনিতেও টের পাওয়ার কথা।

বহু মেয়েই আপনাকে মন দিয়েছিল, তাদের দিকে তাকানোর সময় আপনার ছিল না।

সময় ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে টেরও পেতাম না ভেবেছ? শুধু তোমারটাই টের পাইনি। কোনওদিন। তবে নীলু টের পেত কি না জানি না।

কান্নার আগে যেমন মুখ হয়, গৌরীর মুখ এমন ঠিক সেইরকম। চোখ স্থির, লাল, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আবেগটাকে ঠেকাচ্ছে। পাখাটা রেখে ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় দবজায় নবর মা উঠে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে আবছায়াতেও বুড়ির নজর মদনকে চিনে ফেলেছে। চোখে ভারী অবাক ভাব। মুখখানা হা করা।

মদন মৃদু একটু হেসে বলে, এই যে মাসি! আপনার বউমার চাকরির একটা খবর আছে। তাই দিতে এলাম।

নিজে এলে! কী ভাগ্যি! আমি ভাবছিলাম, বড় মানুষ, বোধহয় গরিবের কথা ভুলেই গেছ।

বুড়ির গলাটা টনটনে। স্বাভাবিক স্বরটাও সাতবাড়িতে শোনা যায়।

মদন বলল, নব আমার সাকরেদ ছিল। তার জন্য এটুকু করা কিছু না।

তা ঠিক।–নবর মা একগাল হেসে বলে, তা কাল থেকেই কি যাবে বউমা?

মদন মাথা নেড়ে বলে, না মাসি। চাকরি এখানে নয়, দিল্লিতে।

দিল্লি? ও বাবা, তা হলে এখানে কী হবে?

এখানে আপনি তো রইলেন।

বুড়ি গলাজলে আঁকুপাকু খেতে থাকে। কথা ফোটে না মুখে। এই সময়ে বুড়ির পাশ কাটিয়ে গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মদন চোখ টিপে বলে, চাকরি তো এখানেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নবর বউ করতে চাইছে না। বলে, নবব কারখানায় চাকরি করতে নাকি ঘেন্না করে।

বলল?–বুড়ির গলা সাত বাড়ি ছেড়ে সাতটা গাঁয়ে পৌছে যায়।

মদন উঠে পড়ে। ভাগীরথীর মুখ খুলে গেছে। এবার খেউড়ের বেনোজল নেমে আসবে। খুব ইচ্ছে ছিল মদনের, বসে থেকে শুনে যায়। কিন্তু ঘড়ি ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছে। বাইটার্সে মিটিং। বিকেলে পার্টির জরুরি সভা।

মদন দাঁড়িয়ে বলল, আমি দিল্লি গিয়েই ব্যবস্থা করছি। নবর বউ যেন তাড়াতাড়ি চলে যায়। সম্ভব হলে আজই।

গিয়ে কোথায় উঠবে?

সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চলি।

বলে মদন বেরিয়ে আসে। রাস্তায় পড়ে কয়েক কদম গিয়ে একটু দাঁড়ায়। ওই শোনা যাচ্ছে সারা এলাকা মাত করে নবর মায়ের গলা চৌদুনে পৌছল, গেছো মাগি… অমুকভাতারি… তমুকভাতারি ..

মদন আর দাঁড়াল না। মৃদু একটু হেসে হাঁটতে লাগল। লাগ ভেলকি লাগ! নারদ নারদ!

.

০৯.

সময়ের একটু আগেই পৌছে গেল বৈশম্পায়ন। ভারী লজ্জা লজ্জা করছিল তার। রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন, কিন্তু এখনও ভাল করে দিনের আলোটাও মরেনি।

কিন্তু না পৌঁছে উপায়ই বা কী? কাল থেকে ঘরে শুয়ে শুয়ে শরীরে জড়তা এসে গেছে। আর মনটা পাগল-পাগল করছে কেয়াতলার এই বাড়িটার কথা ভেবে। উদ্দাম এক হাওয়া এসে পালে লাগছে বার বার। বন্দর ছাড়তে বলছে। ভেসে পড়ো। ভেসে পড়ো। সামনে অকুল দরিয়া। মৃত্যুশাসিত এই পৃথিবীতে মানুষের সময় বড় কম। লাভালাভ, ভোগ-উপভোগ সব সেরে নাও বেলাবেলি।

আজও দরজা খুলল কিশোরী ঝি পুনম। বাইরের ঘর আজ আরও পরিপাটি সাজানো। চন্দনের গন্ধওয়ালা ধূপকাঠি জ্বলছে। অন্তত চার ডজন রজনীগন্ধা। ঘরে কেউ নেই।

ইতস্তত করে বৈশম্পায়ন জিজ্ঞেস করে, মাধব আসেনি?

না, মামাবাবুর তো অফিস।

এ কথায় আরও লজ্জা পায় বৈশম্পায়ন।

বড্ড বেশি আগে আগে চলে এসেছে। এখন কিছু করার নেই। সে সোফার এক কোণে বসে সিগারেট ধরাল। ভিতরে ভিতরে একটা কামনা শেয়ালের মতো ছোঁক ছোঁক করছে, উঁকি মারছে এদিক-সেদিক।

কিন্তু এই নিরিবিলি ঘরটিতে বসে, ঠুলি পরানো আলোয় কিছুক্ষণ চারদিকের ভৌতিককে অনুভব করতে করতেই দূর, বহু দুর থেকে মৃত্যুদীর করুণ গান ভেসে এল। সাদা পাথর, বিশাল উপত্যকা, অন্তহীন নদী, অবিরল তার গান।

জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল আঙুল থেকে। নিচু হয়ে তুলবার সময় সে দুর্দান্ত সুগন্ধটা পেল বাতাসে। এইসব সুবাস মাখে একজন। মাত্র একজনই। সে ঘরে এসেছে নিঃশব্দে। সিগারেটটা কুড়োতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিল বৈশম্পায়ন।

সামনে সোফায় ততক্ষণে মুখোমুখি স্থির হয়ে বসেছে ঝিনুক।

বৈশম্পায়ন মুখ তুলে বলল, কী খবর?

ঝিনুকের পরনে বেরোনোর পোশাক। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে চটি, চোখে ভ্রূকুটি।

ঝিনুক মৃদু কিন্তু রাগের গলায় বলে, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

বৈশম্পায়ন একটু অবাক হয়ে বলে, সে কী? কেন?

কেন তা আপনাদের বোঝা উচিত।

বৈশম্পায়ন ঝিনুকের অসহনীয় সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে মনে মনে ভীষণ হতাশা বোধ করে। এত রূপ যার সে কি কখনও সহজলভ্য হতে পারে? বড় দূর, বড় দুর্লভ ঝিনুক।

সে বলল, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার জন্যেই নাকি?

আপনার জন্য! ও মা, কী কথা বলে লোকটা! আপনার জন্য বাড়ি থেকে পালাব কেন?

বৈশম্পায়ন আবার লজ্জা পেয়ে বলে, তা হলে?

বাড়ি থেকে পালাচ্ছি আপনার বন্ধুর জন্য। কাউকে খেতে বললেই কি সঙ্গে একটা ককটেলেরও অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে? এত বিরক্তিকর। দেখবেন আয়োজনটা?

বলে ঝিনুক উঠে লিভিংরুমে চলে যায়। একটু বাদে দু হাতে গোটা চারেক বড় বোতল নিয়ে আসে। বলে, শুধু এতেই শেষ নয়। আরও ছ'টা বিয়ারের বোতলও আছে। ফ্রিজে সব ঠান্ডা হচ্ছে। কার না মাথা গরম হয় বলুন তো?

বৈশম্পায়ন স্কচ দেখে এবং বিয়ারের কথা শুনে শুকনো জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, ঠিকই তো।

ঝিনুক ঝংকার দিয়ে বলে, আর ভাল মানুষ সাজতে হবে না। মদ দেখলেই আজকাল পুরুষগুলো এমন হ্যাংলামি করে। এতে আপনারা কী আনন্দ পান বলুন তো!

আনন্দ! ওঃ, না ঠিক আনন্দ নয় বটে।

ঝিনুক ভীষণ জোর ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, একটুও আনন্দ নেই। মদ খেয়ে ভুল বকে, আনবিকামিং বিহেভ করে, তারপর বমি আছে, হুল্লোড় আছে। কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো। তবু গুচ্ছের পয়সা খরচ করে সেই অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চাই।

সেই জন্যই আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন?

ঝিনুক পুনমকে ডেকে বোতলগুলো আবার ফ্রিজে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, বোতলের গা থেকে মেঝেয় জল পড়েছে, মুছে নিয়ে যা তো!

ঘর মুছে পুনম চলে যাওয়ার পর ঝিনুক বলল, আমার কথার একটুও দাম দেয় না। এম পি বন্ধু এসেছে তো কী হয়েছে? তাই বলে বাড়িটাকে শুঁড়িখানা বানাতে হবে? আর আজকালকার এম পিরাই বা কীরকম? যখন তখন তারা মদ খাবে কেন?

মদের সপক্ষে কেউ বলার নেই দেখে বৈশম্পায়ন খানিক ভেবে এবং খানিক সাহস সঞ্চয় করে মৃদু করে বলল, ঠিক মদ খাওয়া নয়। স্টিমুল্যান্ট হিসেবে একটু খাওয়া খারাপ নয়। অনেক বড় বড় লিডারও খেতেন।

স্টিমুল্যান্ট! বলে ঝিনুক ব্যঙ্গের হাসি হাসল। বলল, তা হলে তো বলার কিছুই ছিল না। আমি আপনার বন্ধুকেও চিনি, মদনকেও চিনি। মদ পেলে এমন হামলে পড়বে যে, দেখলে মনে হয় এটা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনও ইমপরট্যান্ট জিনিস নেই। হোটেল থেকে এক কাড়ি দামি খাবার নিয়ে আসবে, তার কিছুই শেষ পর্যন্ত খেতে পারবে না। বহুবার এরকম ঘটেছে।

তা হলে তো–বলে বৈশম্পায়ন সংশয় প্রকাশ করে।

সেই জন্যেই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। মাতালদের আমি দু চোখে দেখতে পারি না।

সব কথা যে বৈশম্পায়ন শুনতে পাচ্ছে বা বুঝতে পারছে তা নয়। সে চেয়ে আছে, বুঝবার চেষ্টাও করছে, কিন্তু ঝিনুকের সৌন্দর্য থেকে একটা সম্মোহন ওর গায়ের সুগন্ধের মতোই বার বার উড়ে এসে আচ্ছন্ন করছে তাকে। ঝিনুক! কী সুন্দর!

বৈশম্পায়ন সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুজে রেখে বলল, আপনি যদি বেরিয়ে যান তা হলে আমারও খালি বাড়িতে বসে থাকার মানে হয় না।

এই বলে বৈশম্পায়ন উঠতে যাচ্ছিল, ঝিনুক ভারী নরম মায়াবী গলায় বলল, আপনি তো ওদের মতো একন্ট্রোভারট নন, তবে আপনি খান কেন বলুন তো! যারা সিরিয়াস মানুষ, যাদের মনের গভীরতা আছে তারা কেন এসব বাজে ফুর্তি করবে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

বৈশম্পায়ন অপরাধী মুখ করে লাজুক গলায় বলে, আমার মনে কোনও নেশা নেই, তবে প্রেজুডিসও নেই।

নেশা মাধবেরও নেই। কিন্তু কোনও অকেশন পেলেই মদের চৌবাচ্চায় লাফিয়ে পড়বে। আজকাল লোকে এত মদ খায় কেন তা আমি একদম বুঝতে পারি না।

বৈশম্পায়ন সম্মোহনের আর একটা ঘোর কাটাল।ঝিনুক! কী সুন্দর!

মৃত্যুনদীর কলরোল কানে ভেসে আসছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে আয়ু। জীবনে সময় বড় কম। বড় কম। তুমি কি জাননা, ঝিনুক, কিশোরী বয়স থেকে আমি তোমার প্রেমিক।

বৈশম্পায়ন যে হাসিটা হাসল তা সম্মোহিতের হাসি। বলল, কেন যে খায় তা আমিও জানি না। মদের দামও আজকাল ভীষণ, তবু তো খাচ্ছে।

ঝিনুক ভ্রু কুঁচকে বলল, মদের দাম কি খুবই বেশি?

খুব বেশি। প্রতি বছর বাজেটে ট্যাকস বসে আর দাম ওঠে।

ওই বোতলগুলোর দাম কত হবে জানেন?

মাথা নেড়ে বৈশম্পায়ন বলে, আমার ঠিক আইডিয়া নেই। তবে পঞ্চাশ-ষাট টাকা বা তারও বেশি।

চোখ কপালে তুলে ঝিনুক বলে, একেকটা বোতলের অত দাম?

খুব কম করে ধরেও।

ইসস। বলে ঝিনুক তার চমৎকার হাতখানা হোট কপালে রেখে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

মদ খুবই একসপেনসিভ নেশা। বৈশম্পায়ন মৃদুস্বরে বলে, আপনি কি জানতেন না?

ঝিনুক কুটি করে বৈশম্পায়নের দিকে চেয়ে বলে, আমার মদের দাম জানার কথা নাকি?

বৈশম্পায়ন ঢোক গিলে বলে, ঠিক তা মিন করিনি। তবে আজকাল সবাই সব খবর রাখে।

ঝিনুক বিরক্ত গলায় বলে, আমি সকলের মতো নই।

বৈশম্পায়নের ভিতর থেকে কে যেন সঙ্গে সঙ্গে পো ধরে, তা ঠিক। আপনি অন্যরকম।

ঝিনুক আবার ভ্রুকুটি করতে গিয়ে হেসে ফেলে বলে, আমি কীরকম বলুন তো?

বৈশম্পায়নের ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই মরে যায়। আর একটা সম্মোহনের ঢেউ এসে আচ্ছন্ন করে তাকে। ঝিনুক! কী সুন্দর! তুমি যেখান দিয়ে হেঁটে যাও সেই পথে সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে থাকে। যেদিকে তাকাও, আলো হয়ে যায়। তোমার জন্যই সেতু বন্ধন। তোমার জন্যই ট্রয়ের যুদ্ধ। তোমার জন্যই বেঁচে থাকা মরে যাওয়া। তুমি কীরকম তা কি বলে শেষ করা যায়? কথার অত ক্ষমতা নেই ঝিনুক।

ঝিনুক এই অসহায় লোকটিকে রেহাই দিয়ে একটা খাস ফেলে বলল, আমি ভীষণ খারাপ, জানি।

না, না।-বৈশম্পায়ন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

ঝিনুক উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনার বন্ধুর ফিরতে দেরি হবে। অফিস থেকে বেরিয়ে কোন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যাবে খাবার আনতে।আপনি কি ততক্ষণ একা বসে থাকতে চান?

না।–বৈশম্পায়ন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বরং একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবেন?

বিশেষ কোথাও না।

ঝিনুক মৃদু একটু হাসে। বলে, তা হলে আমার সঙ্গে চলুন।

কোথায়?

আমার বোন থাকে কাছেই, গোলপার্কের ওদিকটায়। ওর জন্য একটা ঝি ঠিক করেছি, বলে আসি।

বৈশম্পায়ন এত সৌভাগ্যের কল্পনা করেনি। একটু অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে থেকে বলল, চলুন।

.

১০.

গড়িয়া স্টেশনের খানিকটা আগেই চলন্ত ইলেকট্রিক ট্রেনের কামরা থেকে একটা লোক লাইনের ধারে লাফিয়ে নামল। কাজটা খুব সহজ নয়। ইলেকট্রিক ট্রেনের কামরায় নামবার সিড়ি নেই, পাটাতনও বেশ উঁচু আর লাইনের ধারে অতি সংকীর্ণ জায়গায় নুড়ি

পাথর ছড়ানো, যমদূতের মতো গা-ঘেঁষা লোহার পোস্ট। কিন্তু লোকটা নামল অনায়াসে, যেন প্রতিদিন এইভাবে নামা তার অভ্যাস। কামরার কিছু লোক তাকে বহুক্ষণ লক্ষ করছিল, এখন তারা মুখ বের করে তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে দেখছে। কেউ অবশ্য কিছু বলল না। তার চেহারাটাই এমন যে, লোকে কিছু বলতে সাহস পায় না, কাছে এগোতে চায় না।

ট্রেনটা এগিয়ে গিয়ে থামল। কয়েকশো গজ দূরেই স্টেশন। স্পষ্ট বিকেলের আলোয় সব দেখা যাচ্ছে। বহু লোক। গিজগিজে ভিড়। সে এখন যতদূর সম্ভব ভিড় এড়াতে চায়।

নামবার সময় উপুড় হয়ে মাটিতে হাতের ভর দিয়েছিল সে। এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ঘষাঘষি করে ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলল।

চারিদিকে শরতের ভারী সুন্দর এক বিকেল। বাঁয়ে গড়িয়ার বাজারে বোধহয় আজ হাট বসেছে। খালে একমাথা ভর ভরন্ত জল। আকাশে হেঁড়া হেঁড়া মেঘ। গাছপালা গভীর সবুজ। মেঠো গন্ধ। অবারিত মুক্ত মাঠঘাটে অগাধ বাতাস। গরম না, ঠান্ডাও না। লোকটা অবশ্য প্রকৃতির এই সাজগোজ লক্ষ করল না। তার সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখ চারিদিকে ঝেটিয়ে পরিস্থিতিটা দেখে নিচ্ছিল। যা দেখল তাতে নিশ্চিন্ত হল সে।অবশ্য এই নিশ্চিন্ত অবস্থাটা বেশিক্ষণের জন্য নয়। বহু চোখ তাকে খুঁজছে। খুঁজে পেলে যে আবার ধরে জেলে পুরবে, তা নাও হতে পারে। বেকায়দা দেখলেই গুলি চালাবে। তার অবস্থাটা খুব সুখের নয়। সুখে সে কোনওকালে ছিলও না। একটা রাতও নিশ্চিন্তে ঘুমোয়নি বড় হওয়ার পর থেকে। কোনও পথেই সাবধান না হয়ে হাঁটেনি কখনও। খুব ঘনিষ্ঠ লোককেও আগাপাশতলা বিশ্বাস করেনি।

ইশারা ছিল অনেক আগে থেকেই। দিন পনেরো আগে একজন পলিটিক্যাল আড়কাঠি জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করে যায়। বেশি ধানাই-পানাই করেনি, সোজা বলেছে, আমাদের হয়ে কাজ করবে?

সে বরাবরই এ দলের বা সে দলের হয়ে কাজ করেছে। সুতরাং এ প্রশ্নের জবাব দিতে ভাবতে হয়নি, করব।

ব্যস, কথা ওইটুকুই। কিন্তু তার মধ্যেই ইশারাটা ছিল। পরশু বিকেলে একজন কয়েদির মারাত্মক পেট ব্যথা। তাকে পুলিশের গাড়িতে হাসপাতালে নেওয়ার সময় তার ডাক পড়ল স্ট্রেচার ধরতে। হাসপাতাল পর্যন্ত রুগির সঙ্গে ছিল সে। বেড়ে তুলে দিল। আর তারপরই দেখল, পালানোর জন্য কসরতের দরকার নেই। শুধু ইচ্ছে। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সে পেচ্ছাপখানা হয়ে পিছনের সিড়ি দিয়ে নেমে গেল। কয়েদির পোশাকটাই ছিল সবচেয়ে বেখাপ্পা জিনিস, কিন্তু কলকাতার লোক আজকাল এতরকম বিচিত্র পোশাক পরে যে, লোকে তেমন মাথা ঘামায় না।

লোকটার বুদ্ধি তেমন বেশি নয়, লোটার মনে খুব একটা জটিলতা নেই, দুনিয়া সম্পর্কে তার ধারণা খুবই স্পষ্ট এবং মোটা দাগের। তার বেশির ভাগ অনুভূতিই শারীরিক। যেমন যৌনতা এবং ক্ষুধাবোধ। তবে শরীরের ব্যথা-বেদনার বোধ তার খুবই কম। তার মানসিক অনুভূতি এক আঙুলে গোনা যায়। কোনও ফালতু দুঃখ-টুঃখ আর তার নেই। শুধু আছে একটা প্রচণ্ড একরোখা আগুনে। রাগ, আছে ভয়ংকর রকমের টাকার লোভ, দুনিয়ায় প্রায় কারও প্রতিই তার কোনও গভীর ভালবাসা নেই, মানুষকে খুন করতে তার দুঃখ হয় না বটে, কিন্তু খুন করার পর সে বহুক্ষণ খুব অস্থির থাকে, তার একটা পশুসুলভ ভয়ও আছে, কিন্তু সেটা খুব কমই সে টের পায়। তবে একটা অনুভূতি তার প্রখর, সে আগে থেকেই বিপদের গন্ধ পায়।

পরশু রাতে কলকাতার ভিড়ে ছাড়া পেয়ে তার প্রথম জেগেছিল এক হিংস্র প্রচণ্ড কাম। সেই। তাড়নায় তার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। আজকাল দুনিয়া খুব তাড়াতাড়ি পাল্টায়, দোস্তরা রং বদলে ফেলে, দল ভেঙে যায়। সে জেলখানায় থাকতে কী কী হয়ে গেছে তা না জানলে সে লাইনটা ধরতে পারবে না। লাইন ধরতে না পারলে বেরিয়েও লাভ নেই। খাবি খেয়ে মরতে হবে। তাই কোনও ঝুঁকি নেওয়া তার উচিত ছিল না। কিন্তু সেই কাম তাকে তাড়া করে আনল কসবা পর্যন্ত। নীতু বরাবর তার বাধ্য ছিল, বাঁধাও ছিল। সে নীলু

হাজরার ফুকো খুনের মামলায় ঘানি টানতে যাওয়ার পর নীতু বিয়ে করেছে। বেশিদিন নয়, মাত্রই। নীতুকে নিয়ে মাঝে মাঝে থাকবে বলে সে রথতলার দিকে বস্তির যে ঘরটা ভাড়া নিয়ে রেখেছিল সেই ঘরেই সংসার পেতে বসেছে।

সেই সদ্য-পাতা সংসারে সে রাত ন'টায় হানা দিল।

কী রে নীতু! জমিয়ে নিয়েছিস?

যে নীতু তাকে দেখলে গলে পড়ত সে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। অদ্ভুত এক নাকিসুরে বলে উঠল, তুমি পালিয়েছ! আঁ!

কেন, তাতে তোর অসুবিধে হল?

বিয়ের জল পড়ে নীতুর রুক্ষ চেহারাটা কিছু ফিরেছে। বেড়ার সঙ্গে সিটিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ও এইমাত্র ম্যাচিস কিনতে মোড়ে গেল, এক্ষুনি আসবে।

লোকটা কে?

তুমি চিনবে না।

কী করে?

আটা চাকি আছে।

তা তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? কিছু খেতে-মেতে দিবি?

নীতু রুটি সেঁকছিল জনতা স্টোভে। ঘরময় কেরোসিনের গন্ধ। এ কথায় একটু সহজ হয়ে বলল, দিচ্ছি। বোসো। এই পোশাকে এলে, লোকে দেখেনি?

দেখেছে।

পুলিশও দেখেছে তা হলে!

দেখলে দেখেছে। ভয় পাচ্ছিস?

নীতু একটু হাসল। একেবারে মড়ার হাসি। মৃদুস্বরে বলল, পুলিশ এলে তো মুশকিল।

তোর মুশকিল কী? মুশকিল তো আমার!

তোমার কথাই ভাবছি।

তোর লোকটার জামা প্যান্ট আছে কিছু?

নীতু মুখ নিচু করে বলল, আছে, তবে তোমার গায়ে হবে না।

দেখি। বের কর।

নীতু খুব দ্বিধা আর অনিচ্ছের সঙ্গে ঘরের একধারে রাখা একটা সস্তা আলনা থেকে একটা প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট নিয়ে আসে। লোকটা দেখে, দিব্যি ফিট করবে তাকে। কোমরটা একটু ঢিলে হতে পারে, ঝুল একটু বেশি। তা হোক, এই অবস্থায় ওটুকু কিছু না।

জামা প্যান্ট পাশে রেখে লোকটা মাটি ওঠা ঠান্ডা মেঝের ওপর বসে বলল, দে।

নীতু খুব আস্তে ধীরে এবং অনিচ্ছের সঙ্গে একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় রুটি আর কুমড়োর তরকারি বেড়ে দিয়ে বলে, ডাল আছে।

কাঁচা লঙ্কা দে, আর পেঁয়াজ থাকে তো পেঁয়াজ। হাতটা কোনওরকমে গ্লাসের জলে একটু ধুয়ে সে দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রথম কয়েক গ্রাস খাওয়ার পরই সচেতন হল। দরজার দিকে মুখ করেই বসেছিল, কিন্তু পাতের দিকে নজর থাকায় খেয়াল করেনি। দরজা খুলে একটা লোক ভিতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে চেয়ে আছে।

চোখ তুলে সে লঘু স্বরে বলে, এসো নটবর। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

লোকটার চেহারা দেখলেই মালুম হয়, একে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। চুলগুলো ছোেেট করে ঘঁটা, ঘাড়টা একটু তুলে কামাননা, রোগা, তামাটে রং, মুখটা ভালমানুষের মতো। খেটে খাওয়া লোকের মতো মজবুত চেহারা। বয়স চল্লিশের কিছুনীচে হবে। সে চোখ পাকিয়ে তাকালে পেচ্ছাপ করে দেবে। লোকটা তাকে একটুক্ষণ দেখেই বুঝে গেছে। ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে বিছানায় গিয়ে বসল। নীতু টু শব্দটি করল না।

কয়েক চোপাটে রুটি উড়িয়ে ভরপেট জল খেয়ে লোকটা উঠল। এবার আর একটা কাজ। নীতুকে চাই।

চাই বটে কিন্তু সমস্যা এই ফালতু লোকটাকে নিয়ে মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এ লোকটা ভিতু, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি ঘর থেকে একে বের করে দেওয়া যায় তবে বাইরে গিয়ে বস্তি আর পাড়ার লোক জুটিয়ে আনতে পারে। আর ঘরে থাকলে নীতুর অসুবিধে। শত হলেও এর সঙ্গেই ততা সে ঘর করছে।

তবে এসব সমস্যা নিয়ে ফালতু মাথা ঘামাতেও সে রাজি নয়। এতকাল সে নীতুকে যেমন ইচ্ছে কাজে লাগিয়েছে। দু’দিন চোখের আড়াল হয়েছিল, সেই ফঁাকে এই ট্রেচারি। সুতরাং নীতুর যদি কিছু অসুবিধে হয় তবে সেটা ওর পাওনা।

লোকটা তার হাফপ্যান্টে হাত মুছে বলল, তারপর কাপ্তান! কী খবর? নীতু তোমার দেখভাল ঠিকমতো করছে তো?

লোকটা হাঁ করে চেয়েছিল। হাতে একটা বিড়ির বান্ডিল আর একটা দেশলাই তখনও ধরা। কথার জবাব দিতে গিয়ে দু’বার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, হ্যাঁ।

জেলখানার কামিজটা গা থেকে খুলে ফেলে সেইটে ঘুরিয়েই লোকটা একটু হাওয়া খেয়ে পরিস্থিতিটা ঠিকমতো বুঝে নিল। নীতু তাকে জানে, সুতরাং নীতু ঝামেলা করবে না।

কিন্তু এই লোকটা করতে পারে। আর কিছু না হোক, ভয়ে চেঁচাতে পারে। এই ঘরটার সুবিধে যে, এটা কোনার ঘর। উত্তর দিকে আর ঘর নেই, উঠোন। কিন্তু দক্ষিণের ঘরে লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বস্তি জুড়েই নানারকম কথাবার্তা, চেঁচানি, চঁা ভা, চেঁচানোমাত্রই লোক জুটে যাবে।

লোকটা খুব ঠান্ডা গলায় নীতুর মানুষকে বলল, তুমি যাকে নিয়ে ঘর করছ সে আমার রাখা মেয়েমানুষ, তা জানো কাপ্তান?

লোকটা আবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, একটু-আধটু শুনেছিলাম।

নীতু আসলে আমার মেয়েমানুষ। তুমি ফালতু লোক। তাই না?

লোকটা চোখ সরিয়ে নিয়ে ভয় খাওয়া গলায় বলে, আমি ঝামেলায় যেতে চাইনি। কিন্তু নীতু বলল-লোকটা থেমে যায়।

কী বলল?—সে ধমক দেয়।

বলল আপনার অনেকদিনের মেয়াদ। ওকেও দেখাশোনার কেউ নেই। তাই

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই কাপ্তান। আমার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখন নীতুকে আমি ফেরত চাই। তুমি কী করবে?

আমি!—বলে লোকটা অগাধ জলে পড়ে চারদিকে তাকাল।

এতক্ষণ নীতু কথা বলেনি। কিন্তু এইবার আটা মাখা হাত শব্দ করে ঝেড়ে বলল, নবদা, আমি ওকে বিয়ে করেছি। তুমি এখন ওসব কথা বোলো না।

তোরও বিয়ে হয় নীতু? ঘাঁটাপড়া মেয়েমানুষের বিয়ে? ওপরের ওই বাঁশ দেখছিস? ওর সঙ্গে তোর চুল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখব। বলে সে নীতুর দিকে চেয়ে থাকে।

নীতু চোখ নামায় বটে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার ফেঁপানির শব্দ পাওয়া যায়।

নব নীতুর মানুষটার দিকে চেয়ে বলে, কী করবে কাপ্তান? যাবে? না থাকবে?

লোকটা নীতুর দিকে চেয়ে শুকনো মুখে একটা খাস ছেড়ে বলে, নীতু ছাড়া কি আপনার চলবে না? আমরা অনেক ভেবেচিন্তে গুছিয়ে সংসার পেতেছিলাম।

ওসব বাত ছাড়ো। আজ রাতের মতো নীতুকে আমার চাই। তুমি বসে বসে দেখবে? না যাবে?

লোকটা জিব দিয়ে ঠোঁট চাটল। প্রাণের ভয় বড় ভয়। তবে তলানি সাহসটুকু উপুড় করে ঢেলে সে বলল, নীতুকে আমার খুব পছন্দ ছিল। ওকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে দাদা। বলতে বলতে তার চোখে টলটল করে জল ভরে এল।

নীতু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, তোমারও তো বউ আছে নবদা? গৌরীদিকে জিজ্ঞেস কোরো তো, পারে কিনা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে

এ কথায় নব আর একটু গরম হল। চাপা হিংস্র গলায় বলল, মুখ ভেঙে দেব বেশি কথা বললে। লোকটার সাহসের তলানি আরও কয়েক ফোঁটা অবশিষ্ট আছে দেখা গেল। সে বিড়ি আর দেশলাই বারবার এ হাত ও হাত করতে করতে বলল, নীতুকে কি আপনি বরাবরের জন্য চান দাদা? না কি আজ রাতটা হলেই চলে?

লোকটা ব্যবসা জানে। নব কামিজটা দুরের আলনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, অত সব ভেবে দেখিনি। এখন চাই, এটুকু বলতে পারি। লোকটা শুকনো মুখে বলল, আমাদের একটা সিস্টেম না। কী যেন বলে তাই তৈরি হয়ে গেছে তো! তাই বলছিলাম

কী বলছিলে কাপ্তান?

বলছিলাম নীতুকে ছাড়া যদি আপনার না চলে তা হলে আজ রাতের মতো আমি বরং আমার এক পিসি আছে বাঘাযতীনে, তার কাছে গিয়ে থেকে আসি। কাল পরশু আমরা অন্য জায়গায় উঠে যাব।

এই সময় নীতু হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, না, তুমি যাবে না। কিছুতেই যাবেনা! বলে উঠতে যাচ্ছিল নীতু।

নব তখন মারল। বেশি জোরে নয়, ডান পা সামান্য তুলে মাজার একটু ওপরে। নীতু আবার বসে পড়ল। কিন্তু চেঁচাল না। প্রাণের ভয়।

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে বলল, মারবেন না। আমি যাচ্ছি নীতু। কাল বেলাবেলি চলে আসব। ভেবো না।

নীতু বিহ্বল মুখে বসে শূন্য চোখে চেয়ে ছিল। লোকটার কথায় একটু নড়ল। তারপর ধীরে আটা মাখার কানা উঁচু কলাই করা বাটিটা সরিয়ে রাখল।

নব লোকটার দিকে চেয়ে বলে, বাইরে গিয়ে কোনওরকম গোলমাল করবে না তো?

লোকটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। আমি তেমন মানুষ নই। আর নীতু তো আপনার হাতেই রইল।

লোকটা নিঃশব্দে চলে গেলে নব গিয়ে দরজা দিল। তারপর এক ঝটকায় নীতুকে তুলে আনল বিছানায়।

তবে এরকম কাঠের মতো শক্ত, বিস্বাদ মেয়েমানুষ সে জীবনে ভোগ করেনি।

রাতে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আরও দু’ বার নীতুর গায়ে হাত তুলতে হয়েছিল নবকে। তবে খবর বিশেষ কিছু পেল না। হয় নীতু খবর চেপে যাচ্ছিল, নয়তো জানেই না।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ লোকটা আবার এল। মুখ শুকননা, চোখ লাল, বারবার ঢোক গিলছে। নীতু নবর জন্য স্টোব জ্বেলে দ্বিতীয় দফা চা করছিল। শক্ত মুখে একবার তাকাল লোকটার দিকে। কিছু বলল না। লোকটাও না।

শুধু নব খুব আদর দেখিয়ে বলল, কী খবর কাপ্তান? সারা রাত নীতুর কথা ভেবে মেয়েমানুষের মতো কান্নাকাটি করেছ নাকি? তুমি সতী বটে হে?

লোকটা তার দিকে চাইল না। মাথা নিচু করে উবু হয়ে ঘরের মাঝখানটায় বসে রইল।

লোকটার ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাল নব, লোকটার তোলা জলে স্নান করল, লোকটার পয়সায় কেনা চালের ভাত খেল, তারপর লোকটার জামা আর প্যান্ট পরে এবং লোকটার কাছ থেকেই গোটা ত্রিশেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নীতুটা অন্যের হয়ে গেছে। ওকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না ভেবে একটু গা জ্বালা করল তার। কিন্তু এসব গায়ে মাখার মতো সময় নেই। নীতু আর কাপ্তান আজই এ জায়গার পাট ওঠাবে ভেবে রওনা দেবার আগে বলে গেল, ঘরটা আমার নামে নেওয়া আছে হে কাপ্তান, বাড়িওলাকে আবার ছেড়ে দিয়ে যেয়ো না। একটা তালা লাগিয়ে মোড়ে মান্তুর দোকানে আমার নাম করে চাবিটা রেখে যেয়ো।

পালালেই যে মুক্তি পাওয়া যাবে না তা জানে নব। কিছুদিন আগে যে পলিটিক্সওয়ালা দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে পরশু দিনের ঘটনাটা দুইয়ে দুইয়ে চার হয়। সকলের নাকের ডগার উপর দিয়ে সে খুনের আসামি নইলে বেরিয়ে এল কী করে? পিছনে একটা মতলব কাজ করছে। সেই মতলবটা বুঝতে লাইন ধরতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। একবার বেরিয়ে আসতে দিয়েছে বলেই যে পুলিশ জামাই-আদর করবে তা নয়। বিস্তর পুলিশ মতলবটার খবর জানে না।

দিনের বেলা লোকালয়ে তাই একটু গা ছমছম করছিল নবর। তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে সেই পলিটিক্সওয়ালার সঙ্গে মোলাকাত করতে হবে। কিন্তু লাইনটা জানে না নব।

লাইনটা জানতে সে দু-চার জায়গায় ফুঁ দিল। খুব সুবিধে হল না। তবে বিকেলের দিকে বালিগঞ্জে এক পাঞ্জাবির দোকানে রুটি তড়কা খেতে খেতে ক্ষীণভাবে মনে পড়ল, ওই পলিটিক্সওয়ালা যে পার্টির লোক সেই পার্টির একটা ছোকরাকে সে চেনে। নাম জয়দ্রথ। তার দাদা এক ব্যাঙ্কের অফিসার, তারও একটা শক্ত যেন কী নাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওই একই গ্রুপের লোক মদনদাও। আর কে না জানে মদন ফোর টুয়েন্টি তাকে পুরো ফল্স কেসে ঘানি গাছে জুড়ে দিয়েছিল!

লাইন থেকে নেমে ডান হাতে পিচ রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে নবর গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল রাগে।

জয়ের বাড়িটা খুঁজে বের করতে খুব সময় লাগল না নবর। জয় বাড়িতে নেই, তার মা বলল।

কখন আসবে জানেন?

কী জানি বাবা। এম পি মদন কলকাতায় এসেছে, তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাদিন।

মদন এসেছে! নবর গায়ের রোঁয়া আর একবার দাঁড়াল। গা- জ্বালা করল তার।

দুনিয়ার রং এ বেলা ও বেলা পালটে যায়। যারা তার পালানোর পথ করে দিয়েছে তাদের রং পালটাবে। কিন্তু একসময়ে যার হয়ে সে খুনখারাপি মারদাঙ্গা করেছে, বিস্তর ঝামেলা থেকে তাকে নিজের জান দিয়ে বাঁচিয়েছে তার বেইমানির শোধ নেওয়ার মওকা আর পাবে না।

নব বড় রাস্তার কাছাকাছি একটা তেমাথায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

১১-১৫ প্রথম থেকেই মিটিং

১১.

প্রথম থেকেই মিটিং-এ বেড়াল কুকুরের ডাক আর টেবিল চাপড়ানি চলছিল। কর্মী বৈঠকে এরকম মাঝে মাঝে হয়ও। কিন্তু আজকের মিটিংয়ের টেম্পাে প্রথম থেকেই অ্যায়সা চড়েছিল যে, কারও কোনও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। দলের রাজ্য কমিটির সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার থেকে শুরু করে জনা দশ-বারো নেতা পার্টি অফিসের বড় ঘরের মেঝেয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে শতরঞ্চিতে অসহায়ভাবে বসা। তার মধ্যে মদনদাও। সবাই কথা বলার চেষ্টা করে হেদিয়ে পড়েছে। সেক্রেটারি বার তিন চার চেষ্টা করেছিলেন, একবার একটা গোল করে পাকানো সিগারেটের প্যাকেট এসে তার কপালে লাগল, সেই সঙ্গে চিকার, বসে পড়ো চাদু। সেক্রেটারি সেই যে বসে পড়েছেন আর ওঠেননি। ট্রেজারার একবার বাথরুমে যেতে চেয়েছিলেন, তিন-চারটে ষণ্ডা ছোকরা কাঁধ চেপে বসিয়ে দিল ওসব হবে না। গুরুপবাজির হিল্লে করে নাও আগে, তারপর হিসি টিসি।

জয় খুব ভিতরে সেঁধোতে পারেনি, দরজা দিয়ে ঢুকে প্রচণ্ড ভিড়ে দেয়ালে সেঁটে গেছে। পাশে হরি গোঁসাই, জয় ফিসফিস করে একবার বলল, বড় বড় নেতারা এভাবে হেকেল হচ্ছে, এ খুব অন্যায়।

হরি খিক করে হেসে বলে, চেপে যা। হচ্ছে হোক। একটু হওয়া দরকার।

মদনটা কোনও ইনিসিয়েটিভ নিচ্ছে না, দেখেছ?

চালাক লোক। পাবলিকের চোখে ইমেজ রাখছে।

কিন্তু মদনা দাঁড়ালে সব সমাধান হয়ে যাবে।

হলে এতক্ষণে মদনদা দাঁড়াত রে। তা নয়। কালকের ক্লোজডোর মিটিং- এ বসে নেতারা এককাট্টা হতে পারেনি।

বিমর্ষ মুখে জয় বলল, আজকাল নেতারা একদম এককাট্টা হতে পারছে না হরিদা। কী হবে বলো তো?

দল ভাঙবে। আবার কী? বাঁ কোণে নিত্য ঘঘাষ বসে আছে কেমন বেড়ালের মতো মুখ করে দেখছিস?

জয় একটা শ্বাস ফেলে বলল, দেখেছি। কিন্তু নিত্যদা আলাদা দল করতে চাইলেই কি হবে? নিত্যদার যে সেই ইয়েটা, কী যেন বলে, সেইটে নেই।

কিয়েটা?

ওই যে!–জয় সহজ ইংরিজি শব্দটা হাতড়াতে হাতড়াতে বলে, ওই যে ইনফ্লুয়েন্স না কী যেন!

তোর মাথা। এই মিটিং-এ বারো আনাই নিত্য ঘোষের লোক!

সে বুঝেছি। কিন্তু কী করে হয় বলো তো হরিদা। নিত্যদা তিনবার অ্যাসেমব্লিতে দাঁড়িয়ে হেরে গেছে। ওকে কে পোঁছে?

সবাই কি ভোটে জেতে? জিতলেই যে তাকে সবাই পোঁছে এমনও নয়।

আমি বলছি হরিদা, একবার মদনদা যদি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে তা হলে

কী বোঝাবে?

এটা যে নিত্য ঘোষের চক্রান্ত সেই কথাটা।

বিপদ আছে রে।

কী বিপদ?

তখন নিত্য ঘোষও উঠে দাঁড়িয়ে মদনদার আর-একটা চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। ওরা কেউ কাউকে ঘাঁটাতে চাইছে না এখন। দল ভাগ হলে তখন কোমর বেঁধে লড়বে। এখন ক্যাডার কালেকশন।

মদনদার চক্রান্তের কথা নিত্য ঘোষ কী বলবে? মদনদার আবার চক্রান্ত কী? তুমি যে কী বলল হরিদা।

হরি গোঁসাই কী একটু বলার জন্য চুলবুল করেও সামলে গেল, বলার তো ট্যাকসসা লাগে না। পাবলিকের সামনে একটা কিছু টক ঝাল বললেই পাবলিক খেয়ে নেয়। আর পলিটিক্সওয়ালাদের কটা কথা সত্যি? চক্রান্ত না থাকে তো বানিয়ে একটা বলে দেবে।

লোকে বিশ্বাস করবে না।

চেঁচামেচি বাড়ছিল। আগের দিকে খুব একটা ঠেলাঠেলি চলেছে। একটা ছোকরা কী একটা বলছিল চেঁচিয়ে, তিন-চারজন তাকে ধরে খুব ঝাকাচ্ছে। ধাক্কা মেরে মেরে ভিড় ঠেলে বের করে আনছে। হরি গোঁসাই আর জয় দুজনেই ছোকরাকে চিনল। মদনদার বডিগার্ড শ্রীমন্ত।

জয় উত্তেজিত হয়ে বলে, স্টেট আর সেন্ট্রাল লিডারদের সামনে কী হচ্ছে দেখো হরিদা!

কিছু করার নেই। দেখে যা।বলে হরি গোঁসাই জয়ের হাতে একটু চাপ দেয়।

এরপর কি পার্টি মিটিং-এও পুলিশ ডাকতে হবে নাকি? প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকল না।

গলা উঁচুতে তুলিস না। লোকে তাকাচ্ছে।চাপা গলায় হরি গোঁসাই বলে।

মদনদা তবু কিছু করছে না, দেখেছ?

কী করবে? এতগুলো অ্যান্টি লোক।

সবাই অ্যান্টি? পার্টি ভাগ হলে মদনদা কোনদিকে থাকবে তা জানো?

হরি গোঁসাই ঠোঁট উলটে বলে, কে জানবে? নিত্য ঘোষ ডিসিডেন্ট, একটু জানি। দিল্লির একটা ফ্যাকশন নিত্য ঘোষকে অ্যাপ্রুভ্যালও দিয়েছে। যে গ্রুপ স্ট্রং হবে মদনা সেই দিকেই থাকবে মনে হয়।

জয় কথাটা শুনে খুশি হল না। একটু টেরিয়া হয়ে বলল, মদনদা কি সেই ধাঁচের লোক? যেদিকে আগুন দেখবে সেদিকেই হাত সেঁকবে?

দূর বোকা! উলটো বুঝেছিস। বলতে চেয়েছিলাম, মদনদা যেদিকে জয়েন করবে সেদিকটাই আলটিমেটলি স্ট্রং হবে। চল, বাইরে গিয়ে শ্রীমন্তকে ধরি। ব্যাপারটা একটু বোঝা যাবে।

জয়ের ইচ্ছে ছিল না। সে এই মিটিং-এর শেষটা দেখতে চায়। কিন্তু সামনের দিকে হুড়োহুড়ি বাড়ছে। ঠেলাঠেলি চলছে ভীষণ। দেখা যাচ্ছে না ভাল, তবে বোঝা যাচ্ছে সামনে আর-একটা মারপিট লেগেছে। মদনদার কিছু হবে না তো?

হরি গোঁসাইয়ের পিছু পিছু জয় বেরিয়ে আসে।

পার্টি অফিসের সামনে বারান্দা। বারান্দার নীচে একটু বাঁধানো জায়গা। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। বিস্তর চেনা অচেনা আধচেনা পার্টি ওয়ার্কার দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীমন্ত ভিড় ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই একটা জিপ। একটা লোক জিপের সামনের সিটের ওপর একটা ভোলা ফার্স্ট এইড বক্স থেকে তুলোয় কী একটা ওষুধ তুলে শ্রীমন্তর কবজিতে লাগাচ্ছে।

শ্রীমন্ত! কী ব্যাপার?–হরি গোঁসাই খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করে।

শ্রীমন্ত একবার বাঘা-চোখে তাকায়। বাবারে, কী চোখ! লাল, জ্বলজ্বলে আগুনে। শ্রীমন্ত বিগড়োলে খুব গড়বড়, সবাই জানে। হরি গোঁসাই দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার সাহস পেল না।

জিপের লোকটা শ্রীমন্তর হাতে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, একটা সিকুইল খেয়ে নিস। এখন বাড়ি গিয়ে বসে থাক। সন্ধের পর যাব।

জিপের লোকটাকে জয় আবছা চেনে। কালো, পেটানো চেহারা, মাথায় টাক, বছর চল্লিশেক বয়স। পরনে খুব ঝা চকচকে প্যান্ট আর দামি হাওয়াই শার্ট। শ্রীমন্তর হাতে ব্যান্ডেজ করে দেওয়ার পর সে একবার খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চাউনিতে জয় আর হরি গোঁসাইকেও দেখল।

শ্রীমন্ত রাগে ফুসছে। গলার শিরা ফুলে আছে, চোখে সেই খ্যাপা দৃষ্টি। বলল, মা কালীর দিব্যি বলছি নদুয়াদা, হেলার লাশ আমি নামাব। না হলে নাম পালটে রেখো।

নদুয়া নামের লোকটা সাপের মতো একটা হিসস শব্দ করে গালের পানটা একটু চিবিয়ে নিয়ে বলল, রি-অরগানাইজেশন হচ্ছে। তখন দেখা যাবে। এখন বাড়ি যা।

শ্রীমন্ত একবার পার্টি অফিসের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকে।

পিছনে সঙ্গ ধরে হরি গোঁসাই। জয় এগোয় না। কয়েক পা সরে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। নদুয়াকে সে চেনে। এর গোডাউন থেকে কয়েক বছর আগে বন্যার সময় মদনদা গম বের করেছিল। গমের মাপ নিয়ে খুব লেগেছিল মদনদার সঙ্গে। নদুয়া বলেছিল, রিলিফের জিনিস আর মাপব কী, ওরকম নিয়ম নেই। যে মাপ বলে দেব সেইটেই ঠিক মাপ। কিন্তু মদনদা ছাড়েনি। বলেছে সরকার যখন দাম দেবে তখন গুনে নেবেন না? তখন চোখ বুজে থাকবেন? শেষ পর্যন্ত দলের ছেলেরা গুদাম ঘেরাও করার ভয় দেখানোয় সব মাল মাপা হয়েছিল। বিস্তর কম ছিল ওজনে। এ সেই লোক। সম্পূর্ণ করাপটেড। তবে পলিটিক্যাল লাইন আছে, টাকা আছে, জিপ গাড়ি আছে, গুন্ডা আছে। শিয়ালদার যে করাপটেড লোকটা যাত্রীদের কাছ থেকে ভড়কি দিয়ে টিকিট নিচ্ছিল তাকে ধমকানো যত

সোজা একে ধমকানো তত সোজা নয়। লোকটা বুকে হাত রেখে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ রাখছে। জিপে ড্রাইভার বসা। প্রস্তুত। মনে হচ্ছে কাউকে তুলে নিয়েই হাওয়া হবে। কাকে তা অবশ্য জয় জানে না!

এত গোলমালে জয়ের মাথা ধরে গেছে; মনটা বড় ভার। মাত্রই সে বিভিন্ন জায়গায় পার্টির বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগে পেতে শুরু করেছে। হিঙ্গলগঞ্জে দলের সংগঠনে তাকে পাঠানোর কথা হচ্ছিল। দু-চার বছর পরেই সে অ্যাসেমব্লির টিকিট পেয়ে যেত। মদনদার মতো করেই নিজেকে তৈরি করছিল সে। আয়না দেখে দেখে বক্তৃতা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে নানারকম এক্সপ্রেশন দেওয়া প্র্যাকটিস করছিল। গলার ওঠা-নামা, হাততালির জন্য ঠিক জায়গায় জুতসই আবেগকম্পিত ভাবালু কথা লাগিয়ে তুঙ্গে উঠে যাওয়া, এ সবই অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল তার। স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ক'বার পিঠ চাপড়ে বলেছেন, তুমি বেশ তৈরি হচ্ছ। কিন্তু হঠাৎ এ হল কী? পাটি যে ভাঙবে তা সে নিজেদু' মাস আগেও কেন জানতে পারেনি?

হরি গোঁসাই ফিরে এসে বলল, চল।

শ্রীমন্তদার সঙ্গে কথা হল?

হল। চল, বলছি।

একটু এগিয়ে গিয়ে হরি গোঁসাই বলে, শ্রীমন্ত মদনার কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

কেন?

তা বলল না। শুধু বলল, অনেক ব্যাপার আছে।

কবে ছাড়ল? কালও তো আঠা হয়ে লেগে ছিল সঙ্গে।

কবে ছাড়ল জেনে কী হবে? আজকাল হকে নকে এ ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জয় গভীর মুখে একটু ভাবল। তারপর বলল, শ্রীমন্তদা ছাড়বে জানতাম।

কী করে জানলি?

হাবভাব দেখে। কদিন আগে আমাকে একবার কথায় কথায় বলেছিল, মদনদার বেস ওয়ার্ক ভাল হচ্ছে না। স্টেট লিডাররা নাকি মদনদার ওপর খুশি নয়। তখনই সন্দেহ হয়েছিল, শ্রীমন্তদা গোপনে অন্যদিকে তাল দিচ্ছে। শ্রীমন্তকে যারা ম্যানহ্যান্ডেল করল তারা কারা জানো? মদনদার লোক নয় কিন্তু।

না, মদনদার লোক হবে কেন? হেলার নাম শুনলি না? হেলা হচ্ছে নিত্য ঘোষের

জানি জানি।–ধৈর্য হারিয়ে জয় বলে, কিন্তু তাই বা হয় কী করে? শ্রীমন্তদা মদনদাকে ছেড়ে দিলে আর একটা গ্রুপে তো তাকে ভিড়তে হবে। সেই গ্রুপটা তো নিত্যদার। তা হলে নিত্যদার লোক ওকে মিটিং থেকে বের করে দেবে কেন?

বুঝতে পারছি না। এখন বাড়ি চল।

গিয়ে?

গিয়ে আবার কী? এখন কেটে পড়াই ভাল।

মদনদা একা রইল যে! যদি কিছু হয়?

কিছু হবে না।

আমাদের দেখা উচিত।

দেখে লাভ নেই। মদনদাকে দেখার লোক আছে। চলল।

হরি গোঁসাইয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জয় বলে, আমার মনে হয় কী জানো? দলে ভাল লোক কেউ থাকবে না।

হরি গোঁসাই চিন্তিত মুখে বলে, তাই তো দেখছি। মদনদা যদি পাওয়ারে না থাকে তবে বিশুটাকে মেডিক্যালে দেওয়া হয়ে গেল। ওদিকে এই সময়ে নবটাও জেল থেকে বেরিয়েছে। কীযে হবে!

সারা পথ জয় সেই অতীতের সুদিনের কথা ভাবতে ভাবতে এল। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। তার মধ্যে রড ধরে তেড়াবেঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল, সেই কবে পালবাজার অবধি একটা সাইকেলে ডবলক্যারি করেছিল তাকে মদনদা। একটা মিটিং সেরে ফিরছিল তারা। রডে বসে মদনদার শ্বাস নিজের ঘাড়ে টের পেতে পেতে, আর এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় ঝাকুনি খেতে খেতে বারবার মনে হয়েছিল, মদনদা একদিন খুব ওপরে উঠবে! সেজদিকে খুব পছন্দ ছিল মদনদার। সেজদিরও মদনদাকে। বাড়িতে এলেই সেজদির সঙ্গে ছাদে গিয়ে পুটর পুটর কথা বলত। জয় টের পেয়ে আনন্দে কণ্টকিত হয়েছে কতবার। মদনদা যদি সেজদিকে বিয়ে করে তো কী দারুণ হয়! হয়নি কেন তা জানে না জয়। একদিন এক পলিটেকনিক পাশ সরকারি চাকরের সঙ্গে সেজদির বিয়ে হয়ে গেল! মদনদা তার বছর চারেক বাদে এম পি হয়।

বাস থেকে নেমে জয় আনমনে মোড়টা পেরিয়ে গলিতে ঢুকল। এ পাড়া দারুণ নির্জন। একধারে জলা, পুকুর জঙ্গল অন্য ধারে কিছু ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর। তবে এরকম থাকবে না। নতুন প্ল্যানিং-এ চল্লিশ ফুট চওড়া রাস্তা হবে। জমজম করবে জায়গাটা।

ঝুপসি একটা গাছতলা থেকে সরু একটা শিস শোনা গেল। তারপর চাপা গলায় কে ডাকল, জয়দ্রথ!

কে?

এদিকে শোন। ভয় নেই।

কে বলো তো?—জয় এগোতে সাহস পেল না। তবে দাঁড়াল।

আমি।-বলে ছায়া থেকে রাস্তায় একটা লোক এগিয়ে আসে।

শরতের রোদ অল্প বেলাতেই মরে গেছে। চারদিকটা ঘোর ঘোর। বেশ ঠাহর করে চিনতে হয়। তবু এক নজরেই চিনল জয়।

নব?

কসবায় পিলু নামে একটি নকশাল ছেলেকে খুন করেছিল নব! পিলুর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে ইয়ারকি ঠাট্টা করতে করতে, ঠোঁটে সেই সিগারেট নিয়েই আচমকা কোমর থেকে দোধার ছোরা টেনে এনে খুব স্নেহের সঙ্গে তলপেটটা ফাঁক করে দিল সাঁঝবেলায়। পিলু যখন মাটিতে পড়ে বুকফাটা চেঁচিয়ে উঠল তখন শান্তভাবে তার হাঁ মুখে হকিবুটসুদ্ধ পা চেপে ধরে সিগারেটে মৃদু মৃদু টান দিচ্ছিল নব। তারপর খুব হিসেব-নিকেশ করে আর-একবার ছোরা চালিয়ে পাঁজরার ফাঁক দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ফুড়ে দিল। তখনও সিগারেটটা জ্বলছে ঠোঁটে। পিলুরই দেওয়া সিগারেট। পিলু নিথর ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সিগারেটটা জ্বলছেনবর ঠোঁটে। ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেছিল হাসিম, তার কাছ থেকে জয়ের শোনা। নবর ওই ‘ভয় নেই’ কথাটাকে জয় তাই বিশ্বাস করে না।

এখনও নবর ঠোঁটে একটা সিগারেট জ্বলছে। সেটা নামিয়ে নব আর এক হাতে জয়ের একখানা হাত ধরে বলল, আড়ালে আয়। কথা আছে।

জয় জানে ভয় পেয়ে লাভ নেই, সাহস দেখিয়েও লাভ নেই। নব যা ভেবে এসেছে তাই করবে। এক ধরনের খারাপ রক্ত নিয়ে নবর মতো লোক দুনিয়ায় জন্মায়। যেখানে থাকে সেই জায়গা জ্বালিয়ে দেয়, যাদের সঙ্গে কাজকারবার করে তাদের সুখ শান্তি বলে কিছু থাকে না।

গাছতলার ছায়ায় জয়কে টেনে এনে নব বলে, বোস। ঘাস একটু ভেজা আছে।

জয় চারদিকে চেয়ে বলে, এ জায়গায় পরশু দিনও কেউটে সাপ বেরিয়েছে। এই গাছটার ফঁাপা শেকড়ের মধ্যে আস্তানা।

নব কথাটা কানে না তুলে বলে, শোন, ক'দিন আগে একজন লোক জেলখানায় আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিল! নাম বলেছিল গোপাল বিশ্বাস। চিনিস?

চিনি।

কোথায় থাকে?

ঠিকানা জানি না। পার্টি অফিসে আসে।

ঠিকানা জোগাড় করে আজই তার সঙ্গে লাইন করতে হবে। চল।

বলে নব আবার জয়ের হাতটা ধরে।

জয় দোনোমোননা করে বলে, এখনই?

এখনই।–বলে নব একটু হাসে।

জয় বলল, চলো।

.

১২.

মদন আপন মনে ফিক ফিক করে হাসছিল। ব্যাপারটা এমন মজার!

রাজ্য শাখার সেক্রেটারি মানুষটা ভাল। দলের কাজে মেতে থাকায় বিয়েটা পর্যন্ত করেননি। বিমর্ষ মুখে হলঘরের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে ছিলেন। মদনের দিকে তাকিয়ে খুব মৃদু স্বরে বললেন, হাসছ? হাসো, খুব হাসসা। আজ হাসারই দিন। না খেয়ে, না

ঘুমিয়ে মারধোর খেয়ে জেল খেটে চল্লিশ বছর ধরে যে স্যাক্রিফাইস করলাম তা কার জন্য? ভেবে আমারও হাসিই আসার কথা, কিন্তু আসছে না কেন বলো তো?

আপনার বয়স কত বলুন তো সুহৃদদা? ষাট বাষট্টি হবে?

পঁয়ষট্টি চলছে। কেন বলো তো?

তা হলে এখনও বিয়ের বয়স আছে। এবার একটা বিয়ে করুন।

ইয়ারকি করছ? এটা কি ইয়ারকির সময়?—ভারী হতাশা মাখানো মুখে সুহৃদ চৌধুরী বললেন।

বিয়ে না করলে কে আপনাকে দেখবে?

যম দেখবে হে। আর কে দেখবে? এইসব ছেলে-ছোকরারা রাজনীতিতে ঢোকার পর থেকে যে ভূতের নৃত্য শুরু হয়েছে তা আর চোখে দেখা যায় না। শিশুপাল, সব শিশুপাল।

মদন হাসতেই থাকে, ফিক ফিক। সেক্রেটারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তাই ভাবছিলাম কার জন্য এই স্যাক্রিফাইস! বিয়াল্লিশে পুলিশ এমন মেরেছিল গোড়ালিতে, আজও একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। জেলে থেকেই গ্যাসট্রিক। বনগ্রামের যে বাড়িটা পার্টির নামে লিখে দিয়েছিলাম বিশ বছর আগে, বাজার যাচাই করে দেখেছি সেটার দাম এখন লাখখানেক টাকা।

মদন হাসছিল ফিক ফিক।

হলঘরে তুমুল কাণ্ড হয়েই যাচ্ছে। এক ছোকরা আর একটা ষণ্ডামার্কার কাঁধে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার বাঁধানো ছবি নামিয়ে ঝপাৎ করে আছাড় মারল। কয়েকবারই জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো এসে নেতাদের শতরঞ্চিতে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট তার চটি দিয়ে সেগুলো নিভিয়েছেন। এবারও আর একটা জ্বলন্ত সিগারেট উড়ে এসে

ট্রেজারারের কেঁচায় পড়ল। উনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কোচাটা টেনে নিলেন, প্রেসিডেন্ট হাতে চটি নিয়েই বসে আছেন, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সিগারেটটার মুখ ভোতা করে দিলেন এক বাড়ি মেরে। ট্রেজারার বললেন, শতরঞ্চিটা বাহাত্তর টাকায় কেনা সেই বিশ বছর আগে। আর কি এ দামে পাওয়া যাবে প্রকাশদা?

প্রেসিডেন্ট প্রকাশ চাটুজ্জে গম্ভীরমুখে বললেন, সবই গেল, আর শতরঞ্চি! তোমার যে বাথরুম পেয়েছিল তার কী করলে?

ট্রেজারার ব্যথিত মুখে বললেন, কী করব? চেপে বসে আছি। পুরনো ডায়াবেটিসের রুগি, বেশিক্ষণ চেপে রাখাও যাবে না। এক সময়ে হয়ে যাবে আপনা থেকেই। শতরঞ্চিটা

মদন মৃদু স্বরে বলে, ভেসে যাক, ভেসে যাক, বেগটা ছেড়ে দিন।

ট্রেজারার বেদনায় নীল হয়ে বলেন, কী যে বলো ঠিক নেই। এই শতরঞ্চিতে কত বড় বড় নেতা বসে গেছেন জানো? তার ওপর এটা ত্রিশ ফুট বাই ত্রিশ ফুট, আধ ইঞ্চি পুরু। একবার বোয়া হয়েছিল, চড়া রোদেই শুকোতে লেগেছিল পনেরো-যোলো দিন।

দু’ গোছ রজনীগন্ধা রাখা ছিল মাঝখানে। দুটো ছেলে এসে পটাপট তুলে নিয়ে গেল। দেখা গেল অদূরেই তিন-চারজন রজনীগন্ধার ডাঁটি বাগিয়ে ধরে তলোয়ার খেলছে।

কী হচ্ছে বলুন তো মদনদা!—একজন মফসসলের এম এল এ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

বলতে না বলতেই ফুলশূন্য দুটো ডাঁটি তীরবেগে উড়ে এসে পড়ল নেতাদের মাঝখানে। প্রবীণ সদস্য যদুবাবু হাত দিয়ে মুখ আড়াল না করলে তার চশমায় লাগত।

জমেছে। মদন আপন মনে বলে উঠল।

নেতাদের মধ্যে একমাত্র নিত্য ঘোষই একটু আলাদা হয়ে বসে আছে। কথা বলছে না। একটার পর একটা পান মুখে দিচ্ছে। পিকদানির অভাবে একটা অ্যাশট্রেতে পিক ফেলছিল এতক্ষণ। সেই অ্যাশট্রেটাও ভরে এল প্রায়।

মদন শূন্য ফুলদানি দুটোর একটা এগিয়ে দিয়ে বলে, নিত্যদা, এটাতে ফেলুন।

ট্রেজারার দেখতে পেয়ে হা হা করে ওঠেন, ওটা খাঁটি জয়পুরি জিনিস। বিশেষ অকেশনে বের করা হয়।

মদন ঠান্ডা গলায় বলে, কতক্ষণ থাকতে হবে তার ঠিক নেই। দেরি হলে নিত্যদার পানের পিক আপনার শতরঞ্চি ভাসাবে যে!

ট্রেজারার উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, কতক্ষণ থাকতে হবে মানে? মিটিং শেষ করে দিলেই চলে যাব।

মিটিং অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা বেরোতে পারছি না।

ওরা কি আমাদের আটকে রেখেছে?

আটকেই রেখেছে।

ঘেরাও নাকি?

অনেকটা তাই।

ট্রেজারার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, ঘেরাও করে লাভ কী? আমরা সাতদিন বসে ডিসিশনে আসতে পারব না।

এই সময়ে সারা ঘরের হুলস্থুল হঠাৎ একটু মিইয়ে গেল। কয়েকটা ছেলে বেশ সুসংগঠিতভাবে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে। তাদের হাতে কয়েকটা কাগজ, মুখ চোখ সিরিয়াস!

সবার আগে যে ছেলেটি, তার চেহারা খুবই চোখা চালাক, সপ্রতিভ। সে কাছে এসে নেতাদের দিকে চেয়ে নরম গলায় বলে, আপনারা যারা আমাদের পক্ষে নন তারা দয়া করে দল থেকে পদত্যাগ করুন। যাঁরা পদত্যাগ করবেন তাদের আমরা আটকাতে চাই না। যাঁরা দলে থেকেও আলাদা ফ্যাকশন করতে চান আমরা তাদের কনফ্রন্ট করব। আমাদের কাছে টাইপ করা পদত্যাগপত্র আছে। কার চাই বলুন!

কেউ কিছু বলতে চায় না। ভাবছে। দিল্লিতে দলে ভাঙন দেখা দিয়েছে, সুতরাং এখানেও ভাঙবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ডামাডোলে কেউ আগে নিজের রং চেনাতে চায় না। অবশ্য নিজের রং যে কী তাও অনেকে বুঝতে পারছে না।

মদন হাত বাড়িয়ে বলল, আমাকে দাও একখানা।

আপনি পদত্যাগ করবেন মদনদা?—ছেলেটা যেন ঠিক বিশ্বাস করছে না।

করব। কারণ আমার দারুণ খিদে পেয়েছে। দাও।

বলে ছোকরার হাত থেকে কাগজ নিয়ে মদন তলায় সই করে ফেরত দিল। দেখাদেখি ট্রেজারার, প্রেসিডেন্ট, গেঁয়ো এম এল এ এবং আরও কয়েকজন হাত বাড়াল।

পাশের দরজা দিয়ে টুক করে বেরিয়ে পড়ে মদন। পদত্যাগ করেছে বলেই বোধহয় কেউ আটকায় না। পিছন দিকে একটা সরু গলি আছে, সেইটে খুঁজতে একটু সময় লাগে। তারপর বড় রাস্তা।

চারদিকে মরা আলোর ভারী নরম একটা বিকেল। খোলা হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস টানে মদন। বাইরে এসে সে এমনই মোহিত হয়ে পড়ে যে, লক্ষই করে না পার্টি অফিস থেকে

একশো-দেড়শো গজ দূরে একটা জিপ গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো কালো ষণ্ডামার্কা টেকো একটা লোক দূর চোখে তাকে দেখছে। হালদারের যে গাড়িতে সে এসেছে তা পার্টি অফিসের উলটোদিকে ফুটপাথ ঘেঁষে পঁড় করানো। কিন্তু মদন গাড়িটার কাছে যাওয়ার কোনও চেষ্টাই করে না। পার্টি অফিসের সামনে এখন অগুন্তি লোক। ওদিকে গেলেই ঘিরে ফেলবে। মদন কালীঘাটের ট্রাম ধরতে এসপ্লানেডের দিকে হাঁটতে থাকে।

ফুটপাথে থিকথিক করছে হকার, বে-আইনি দোকানপাট, ফুটপাথের বাসিন্দাদের সংসার। ট্যানা-পড়া এক মেয়েছেলে কাঠের জ্বালে তরকারির খোসা দিয়ে রান্না চাপিয়েছে। গন্ধে গা গুলোয়। বাস মোটর গাড়ির চলন্ত চাকা থেকে দু’-তিন হাত দূরেই হামা টানছে তার কোলের বাচ্চা।

রিজাইন করেছেন শুনলাম!—একদম কানের কাছে মুখ এনে প্রেমিকার মতো মোলায়েম করে কে যেন জিজ্ঞেস করে।

মদন চোখের কোনা দিয়ে শচীকে একটু মেপে নিয়ে বলল, ওই একরকম বলতে পারো।

তা হলে আপনারাই নতুন দল করবেন?

ঠিক নেই।

শচী শেয়ালের মতো হাসল, কথা দিচ্ছি দাদা, কাল আপনার স্টেটমেন্ট আমাদের কাগজের ফ্রন্ট পেজে বেরোবে।

তোমাদের ফ্রন্ট পেজ ক’টা?

কী যে বলেন?—শচী মাথা চুলকে হাসল, ফ্রন্ট পেজ একটাই, এবার আপনাকে আমরা বড় কভারেজ দেবই।

একটা সত্যি কথা বলবে শচী?

কী, বলুন দাদা!

তোমরা কার দলে?

আমাদের আবার দল কী?

মদন শান্ত স্বরেই বলে, কালকের কাগজে তোমরা আমার স্টেটমেন্ট ছাপবে ঠিকই, কিন্তু মাথার ওপর নিত্য ঘোষের বিবৃতি বসাবে। এ সবই আমি জানি। এখন নিত্য ঘোষেব পালেই হাওয়া। তোমাদের দোষ নেই।

শচী এ নিয়ে কচলাল না। বলল, আপনাদের নতুন দলের কী নাম হবে ভেবেছেন?

একটা কিছু হবে। অল ইন্ডিয়া বেসিসেই হবে। আমরা ডিসিশন নেওয়ার কে?

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আপনি তো পার্টির অল ইন্ডিয়া লিডার। আমরা জানি হাই কমান্ডই আপনাকে হেস্তনেস্ত করতে দিল্লি থেকে এখানে পাঠিয়েছে। আমরা জানি আপনি মালদা মুর্শিদাবাদ বীরভূমের ক্যাডারদের সাপোর্ট পেয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে দল ভাগ হতে শুরু হয়ে গেছে। দিল্লি থেকে আপনি নিশ্চয়ই কিছু শুনে এসেছেন।

ধর্মতলার মোড়ে অফিসভাঙা ভিড়ে দাঁড়িয়ে মদন তার সিগারেটের প্যাকেট বের করল এবং শচীকে অফার না করেই নিজে একটা ধরাল। অভ্যাসবশে শচী হাত বাড়িয়েছিল। মাঝপথে হাতটা ফেরত নিয়ে বলল, আপনাদের ক্যাডাররাই কি মেজরিটি?

জানি না।

শচী ভিড়ের মধ্যে কানের কাছে মুখ এনে বলল, একটা কথা বলি দাদা। নিত্য ঘোষ যতই লাফাঁক, আপনি যেদিকে থাকবেন সেদিকেই পাল্লা ঝুঁকবে। আমরা আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি।

কত কথাই যে জানো তোমরা!

দেখে নেবেন। বলে দিলাম।বলে শচী আবার হাতটা বাড়ায়।

মদন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ওর হাতে দিয়ে দেয়। বলে, কত কায়দাই যে জানো শচী। কিন্তু এবার নিজের পয়সায় সিগারেটটা খেতে শেখো, তাতে খানিকটা সেলফ-রেসপেক্ট আসবে।

কথাটা গায়ে না মেখে শচী বলে, আপনি যে ফোরফ্রন্টে চলে এসেছেন তা সবাই টের পাচ্ছে। নইলে আপনি আসার পর এই গণ্ডগোলটা হল কেন? নিত্য ঘোষ যেটা করছে সেটা পাওয়ার পলিটিক্স। কিন্তু আলটিমেটলি

কার্জন পার্কের ট্রাম গুমটি ছাড়িয়ে, রাজভবনের গাছপালার ডগার ওপর দিয়ে, রঞ্জি স্টেডিয়ামের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এসপ্লানেড ইস্টে আজও নিত্যকার মতো কারা ধর্না দিয়ে বসে আছে, সামনে পুলিশ ব্যারিকেড। একটা ফেরেব্বাজ কলমওয়ালা চোরাই কলম বেচার ভাবভঙ্গি করে কানের কাছে এসে বলে গেল, চাইনি-ই-জ।

মদন ভুলে গেল যে, সে এম পি বা পলিটিক্সওয়ালা। হঠাৎ বলল, ফুচকা খাবে শচী? ওই লেনিন স্ট্যাচুর নীচে একটা ফুচকাওয়ালাকে দেখা যাচ্ছে। চলো।

বলতে বলতেই শচীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে রাস্তা পেরোয় মদন।

একজন ভি আই পি হয়ে কী যে করেন মদনদা!—হাত ছাড়িয়ে শচী হাসল, আর একটু হলে নীল রঙের অ্যামবাসাডারটার মুখে পড়ে যেতাম দুজনে।

পলিটিশিয়ান আর রিপোর্টাররা কখনও টাইমলি মরে না হে শচী। মরলে দেশটা সোনার দেশ হত। ওহে ফুচকাওলা, শুরু করো, শুরু করো! জলদি!

.

১৩.

দক্ষিণগামী বাসের দোতলায় এক ছোকরা হঠাৎ বলে উঠল, এই যে দাদারা! এত তাড়াতাড়ি সব বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন? শুনেছেন কি, কাল রাতে লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে? বধূ শুয়ে ছিল পাশে, শিশুটিও ছিল, তবু মরিবার হল তার সাধ। অথচ দেখুন কবি গেয়ে গেছেন, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। আজ নিজের জীবনের একটা গল্প বলব বলে আপনাদের কাছে এসেছি। গল্প নয়, ঘটনা, বুঝলেন দাদা, বেঁচে থাকার কোনও পথ না পেয়ে আমরা দুই ভাই ব্যাবসা করতে গিয়েছিলাম। বাঙালি ব্যাবসা করতে জানে না এই বদনাম ঘোচাতে দাদা, শ্যামবাজারের মোড়ে আমি আর আমার দাদা একটা দোকানঘর ভাড়া নিতে গেলাম। পেয়েও গেলাম একটা। কিন্তু দাদা, বাড়িওলা পঞ্চাশ হাজার টাকা সেলামি চায়। সেই শুনে আমরা পালিয়ে আসি। কিন্তু বাঁচতে তো হবে! মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। তাই দাদা বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা দুই ভাই অল্প পুঁজি নিয়ে একটা ব্যাবসা শুরু করলাম। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই করতে গিয়ে আমরা তৈরি করেছি একটি ধূপকাঠি। এই বাসে আমাকে প্রায়ই দেখতে পান আপনারা। রেগুলার অনেকেই এই ধূপ ব্যবহার করেছেন। যারা করেছেন তাদের কাছে নতুন করে বলার কিছু নেই। যারা জানেন না তারা জেনে রাখুন, একটি স্টিক জ্বলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, কাঠি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এক ঘণ্টা ঘরে তার গন্ধ ছড়িয়ে থাকে। আমার হাতে যে স্টিক জ্বলছে সেই একই স্টিক সব প্যাকেটে পাবেন। দোকানে বাজারে কিনতে যান, একটি প্যাকেটের দাম পড়বে পঁয়ত্রিশ পয়সা। কিন্তু বাসে কনসেশন রেটে এক প্যাকেট চার আনা, দু'প্যাকেট আট আনা, চার প্যাকেট এক টাকা।এক টাকা! এক টাকা! এক টাকা।...

মদনের নাকের ডগায় চারটে প্যাকেট ধরে বার কয়েক নাড়ে ছোকরা, এক টাকা! এক টাকা!

মদন অলস চোখে চেয়ে বলে, গল্পটা পালটাও। এ পর্যন্ত দশজনের মুখে শুনেছি একই গল্প।

ছোকরা প্যাকেটগুলো ঝট করে টেনে নিয়ে পরের সিটের এক যাত্রীর নাকের ডগায় ধবল, এক টাকা! এক টাকা!

মদনের পাশের লোকটা খিক খিক করে হেসে বলল, বেশ বলেছেন। এরপর লজেন্সওয়ালা উঠেও একই গল্প ঝাড়বে। শুধু কি তাই? গুপিযন্ত্র নিয়ে এক বাচ্চা ছোকরা উঠে ধরবে, তোমার সঙ্গে দেখা হবে বাবুর বাগানে। রোজ ওই বাবুর বাগানে' কঁহাতক শোনা যায় বলুন দেখি! কিছু বলাও যায় না, দেশে বেকার সমস্যা। ভাবি, দুটো করে খাচ্ছে খাক। নেতারা তো আৰ এদের জন্য কিছু করবে না...

তা ঠিক, তা ঠিক।-মদন তাড়াতাড়ি বলল এবং পলিটিক্স এড়াতে দু' স্টপেজ আগে নেমে পড়ল। হাজরার কাছাকাছি একটা ওষুধের দোকান থেকে ফোন করল মাধবকে, একটু দেরি হবেরে!

সে বুঝতেই পারছি।

তুই একা একা স্কচ চালাচ্ছিস নাকি?

না মাইরি।—একটা হেঁচকি তুলে মাধব বলে, ঝিনুক কেটে পড়েছে, জানিস!

চিরতরে নাকি?

বোঝা যাচ্ছে না। একেবারে আনপ্রেডিকটেবল মহিলা। সঙ্গে বৈশম্পায়ন।

বলিস কী?

দে আর হেড অ্যান্ড ইয়ারস ইন লাভ।

দুস শালা! তুই খাচ্ছিস।

একটুখানি। এই মোটে খুললাম।

কত নম্বর বোতল?

এক নম্বর মাইরি বিশ্বাস কর।

তোকে বিশ্বাসের কী? গিয়ে যদি দেখি সব ফাঁক করেছ তা হলে

আরে না না। অনেক আছে। চলে আয়।

অনেক নেই রে মাধব, অনেক নেই। তুই অন্তত হাফ পাইট সাফ করেছিস।

অতটা হবে না। কী জানিস, ঝিনুকটা তো আজ পালিয়ে গেল, দুঃখে দুঃখে খানিকটা খেয়ে ফেললাম।

পালিয়ে গেছে আর ইউ শিয়োর?

তা ছাড়া আর কী হবে? সঙ্গে বৈশম্পায়ন। দুইয়ে দুইয়ে চার।

তা হলে দুঃখের কী? সেলিব্রেট কর।

তাই করছি আসলে। দুঃখ প্লাস সেলিব্রেশন। তবে বড় একা লাগছে। চলে আয়। আর কত দেরি করবি?

স্নান করে জামাকাপড় পালটেই আসছি।

.

১৪.

গড়িয়াহাটে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দু'জনে সূর্যাস্ত দেখল।

আপনার কোনও ডাকনাম নেই?–ঝিনুক আস্তে করে জিজ্ঞেস করে।

বৈশম্পায়ন ফিসফিস করে বলে, আছে। মন্টু।

আমার এক ভাইয়ের নামও মন্টু। ভারী মিষ্টি নাম।

আপনার ভাল লাগলেই ভাল।

কিন্তু আপনি ভারী অদ্ভুত। ওর কোনও বন্ধুই আমাকে আপনি করে বলে না। শুধু আপনি বলেন। কেন বলুন তো!

বৈশম্পায়ন একটু লাল হয়ে বলে, এমনি৷

না। আমার ওসব আপনি-আজ্ঞে ভাল লাগে না। বলুন তুমি! বলুন শিগগির।

তু-তুমি।

শুধু তুমি বললেই হবে না। পুরো একটা বাক্য বলুন।

বলব?

বলতেই তো বলছি।

ঝিনুক! তুমি কী সুন্দর।

বাঃ, বেশ বলেছেন!—ঝিনুক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর আবেগ ভরা গলায় বলে, কতকাল আমাকে কেউ সুন্দর কথা বলেনি। আমি যে সুন্দর সে কথা মনে করিয়ে দেয়নি।

মাধব? মাধবও নয়।

মাধব। মাধব আমাকে একটুও ভালবাসে না। বউকে ভালবাসলে কেউ মদ খায় বলুন!

যুক্তিটা ঠিক বুঝতে পারে না বৈশম্পায়ন, তবে এ নিয়ে আর কথা বাড়াতেও সে আগ্রহ বোধ করে না। তার মুখ গরম, চোখ জ্বালা করছে, গা ঘামছে। অদ্ভুত এক ভালবাসাই এসব ঘটাচ্ছে। সে ঢোক গিলে বলল, ঝিনুক, আমাদের তো খুব বেশি সময় নেই। একটা কথা বলে নেব?

ঝিনুক খুব অবাক হয়ে ফিরে তাকায় বৈশম্পায়নের দিকে, সময় নেই। কীসের সময় নেই বলুন তো!

আয়ুর সময় যে কেটে যাচ্ছে ঝিনুক। যৌবন যায়, বয়স যায়, লগ্ন যায়।

আপনি যে কী সুন্দর কথা বলেন। আমিও ঠিক এসব কথাই ভাবি। আমরা বোধহয় খুব বেশিদিন বাঁচব না, না? আমার তো এমনিতেই মাঝে মাঝে খুব মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কেন ঝিনুক?

কেবল মনে হয়, একদিন খুব বন্যা হয়ে আমরা সবাই ডুবে যাব। কিংবা কেউ আকাশ থেকে অ্যাটম বোমা ফেলবে। না হয় তো ওই যে কী একটা রোগ হচ্ছে বাঁকুড়ায়, এনকেফেলাইটিস না কী যেন, সেই রোগটা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়বে আর আমরা সবাই মাথায় রক্ত উঠে মরে যাব। এত ভয় নিয়ে বাঁচা যায়, বলুন তো! তার ওপর গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যেতে পারে, ভূমিকম্প হতে পারে, গুন্ডা বদমাশ ডাকাত এসে ঘরে ঢুকে খুন করে যেতে পারে, বলুন!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৈশম্পায়ন বলে, তা ঠিক। তবে ওসব কিছু না হলেও এমনিতেই আমরা আস্তে আস্তে বয়স্ক বুড়ো হয়ে যাব ঝিনুক।

আপনার বয়স কত?

বত্রিশ-তেত্রিশ।

যা গম্ভীর হয়ে থাকেন, আপনাকে আরও বেশি দেখায়।

আমি আর মাধব একবয়সি।

জানি জানি। আপনাকে আমি মোটেই বুড়ো বলিনি।

কিন্তু বুড়ো তো একদিন হব ঝিনুক। তুমি হবে, আমি হব, মাধব হবে। সময় বয়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছ না?

আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, বয়স নিয়ে আর ভয় দেখাতে হবে না।

তুমি কি ভয় পাও ঝিনুক!

বুড়ো হতে, মরতে কে না ভয় পায় বলুন। কিন্তু কী একটা কথা বলতে চাইছিলেন যে! হাবিজাবি কথায় সেটা হারিয়ে যাচ্ছে।

কথাটা হারিয়ে গেলেই হয়তো ভাল ছিল ঝিনুক। বলব?

ঝিনুক মৃদু একটু লজ্জার পরাগে মাখা মুখটি মিষ্টি করে নামায়, তারপর মৃদুস্বরে বলে, বলুন না।

কিন্তু বলবে কী করে বৈশম্পায়ন? খুব কাছ ঘেঁষে একটা পায়জামা পরা লোক কখন এসে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে পাছা চুলকোচ্ছে। কিছু লোকের কাণ্ডজ্ঞানের এত অভাব!

বৈশম্পায়ন একটু বিরক্তির গলায় বলে, চলো আর কয়েক পা দুরে গিয়ে দাঁড়াই।

কয়েক পা হেঁটে তারা লোকটার কাছ থেকে নিরাপদ দুরতে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই যে একটা বাধা পড়ল এতেই মুডটা একদম নষ্ট হয়ে গেল বৈশম্পায়নের। সে অনেকক্ষণ রেলিং-এ ভর রেখে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অনেকদিন আগে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার দিয়ে শেষবারের মতো দেখা, বলাই সিংহী লেনে লাহাবাড়ির দেয়ালের

পটভূমিতে স্কুলের ইউনিফর্ম পরা সেই মেয়েটিকে তো আর কখনও পৃথিবীতে দেখা যাবে না। কিছুতেই ফিরবে না বয়স। কিছুতেই উজানে যাবে না তো নদী। নদী শুধু বয়ে যেতে জানে একমুখে। তার কলধ্বনিতে শুধু মৃত্যুর গান। তার ফঁকা শুন্য উপত্যকায় সাদা আর নিশ্চল হিম পাথরেরা পড়ে থাকে।

খুব হাওয়া দিচ্ছিল আজ। বজবজের একটা ট্রেন প্রায় নিঃশব্দে পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল।

বৈশম্পায়ন বলল, ঝিনুক?

উ!

কী ভাবছ?

কত কী! এইমাত্র ইচ্ছে করছিল ওই ট্রেনটায় উঠে অনেক দূর চলে যাই।

কিন্তু ট্রেনটা তত বেশি দূর যাবে না। মাত্র বজবজ পর্যন্ত।

বজবজ কি সমুদ্রের কাছে?

না। গঙ্গার কাছে।

সমুদ্রের কাছে কোনও ট্রেন যায় না?

যাবে না কেন! অনেক ট্রেন যায়। তুমি কি সমুদ্র দেখোনি?

বহুবার। শুধু পুরীতেই গেছি পাঁচবার; ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ, বম্বে, ঘরের কাছে দিঘা

তবু যেতে ইচ্ছে করে?

করে। কে যে আমার নাম ঝিনুক রেখেছিল। আমার কেবলই মনে হয় সমুদ্রের কাছে আমার অনেক ঋণ!

তোমাকে ডাকে সমুদ্র, আর আমাকে ডাকে এক নদী।

তাই নাকি?

তবে সে এক মৃত্যুর নদী। এক নির্জন উপত্যকা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। চারদিকে সাদা পাথর। আর কী যে করুণ সেই নদীর গান।

ঝিনুক ছলছলে চোখ তুলে বলে, সত্যি?

বৈশম্পায়ন একটু থমকাল। ঝিনুক যেভাবে চেয়ে আছে তাতে মনে হয় সে বৈশম্পায়নের নদীটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একজন প্রাপ্তবয়স্কা পরিণতবুদ্ধির মহিলার পক্ষে যেটা খুব স্বাভাবিক নয়।

একটু থেমে বৈশম্পায়ন বলে, দু'ধারে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়। ভীষণ সাদা, শূন্য এক উপত্যকা, সেইখানে এলোচুল বিছিয়ে নদী সারাদিন গুনগুন করে গায়। সাদা সাদা ঠান্ডা পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে চারদিকে। অদ্ভুত না ঝিনুক? শুনলে লোকে আমাকে পাগল ভাববে!

ঝিনুক মাথা নেড়ে বলে, মোটেই না।

বৈশম্পায়ন একটু হতাশ হয়। এত সহজে আর কেউ নদীটাকে মেনে নেবে এরকম আশা সে করেনি। সে বলল, তোমার অদ্ভুত লাগছে না?

না তো! এরকম হতেই পারে।

বৈশম্পায়ন খুবই অবাক হয়ে বলে, হতে পারে?

নীলু যখন মারা গেল তখন কিছুদিন আমারও মৃত্যুর হাওয়া লেগেছিল।-বলে একটু আনমনা হয়ে গেল ঝিনুক। একটু চুপ করে থেকে গলাটা এক পরদা নামিয়ে বলল, জানেন তো, নীলুকে আর আমাকে নিয়ে একটা বিচ্ছিরি কথা রটেছিল!

বৈশম্পায়ন একটু চমকে উঠে বলে, তাই নাকি?

খুব বিচ্ছিবি। যতদূর নোংরা হতে হয়। সেটা রটিয়েছিল আমার এক দূর সম্পর্কের ননদ।

কী রটিয়েছিল ঝিনুক?

ঝিনুক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, একজন ছেলের সঙ্গে একজন মেয়েকে জড়িয়ে যা রটানো যায়। অবশ্য নীলুর সঙ্গে আমার খুব বনত। বিয়ের পর নতুন নতুন শ্বশুরবাড়িতে কাউকেই তেমন ভাল লাগত না। একমাত্র নীলু, কী নরম, কী ভদ্র, কী বুদ্ধি! বেঁচে থাকলে নীলু সবাইকে ছাড়িয়ে যেত। এক এক সময়ে তো আমার মনে হত, নীলু একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রীও হবে।

বৈশম্পায়ন মাথা নাড়াল, নীলু ছিল এক্সেপশনাল, আমি জানি।

তা হলেই বলুন! নীলুকে ভাল না বেসে পারা যায়? কিন্তু ভালবাসা মানেই কি খারাপ কিছু? আমি নীলুর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গেছি, ছবির একজিবিশন দেখেছি, সারা রাত ক্লাসিকাল গানের আসরে গান শুনেছি, এতে কি দোষ? অথচ

এতদিন বাদেও অভিমানে একবার ঠোঁটদুটো ফুলে উঠল ঝিনুকের। একটু সামলে নিয়ে সে বলল, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকগুলো ভীষণ অদ্ভুত। আমাকে একদম সহ্য করতে পারত না, আমি সুন্দর বলে। আর নীলুকেও সহ্য করতে পারত না। কেন জানেন? নীলু ভীষণ ব্রাইট বলে। ওদের ধারণা ছিল নীলু সম্পর্কে সবাই নাকি বাড়িয়ে বলে।

মাধব নীলুকে খুব ভালবাসত। বৈশম্পায়ন বলে।

বাসত কি না কে বলবে! আসলে নীলুর যেটুকু সম্পর্ক ছিল বাড়ির সঙ্গে তা আমার জন্যেই। নইলে নীলুর তখন অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা। ও আমাকে প্রায়ই বলত, পায়ে হেঁটে সারা ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে শহরে ঘুরে বেড়াবে। বলত, দেশের প্রবলেমগুলো ধরতে হবে বউদি, অনেক মানুষের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হবে, এই বুকের মধ্যে সব মানুষকে আমার টেনে নিতে ইচ্ছে করে।

বৈশম্পায়ন চুপ করে থাকে। প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর।

ঝিনুক রেলিং-এ আর একটু ঝুঁকে বলে, আমার শ্বশুরবাড়ির কাছেই নীলু খুন হল সন্ধেবেলায়। উঃ, সে কী সাংঘাতিক কাণ্ড! তরতাজা, ছটফটে, ভীষণরকমের জ্যান্ত নীলু মরে গেছে, ভাবা যায়! তিনদিন আমি একদম বোবা হয়ে ছিলাম। কথা বলতে গেলে মুখ দিয়ে কেবল বুবু শব্দ বেরোত। তারপর থেকেই একটা মৃত্যুর হাওয়া এল। ঘরে বসে থাকতাম, মনে হত বাইরে হঠাৎ একটা হাওয়া। ছেড়েছে। আর সেই হাওয়া কী যেন বলতে চাইছে আমাকে। দৌড়ে যেতাম বাইরে। ছাদে বসে আছি, হঠাৎ মনে হল আমার চারদিকে যেন বাতাসটা ভারী হয়ে ঘুরছে, কিছু একটা ইঙ্গিত করছে। এক এক সময়ে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত, মনে হত, একটা হাওয়া এসে আমার দরজায় জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে, ডাকছে, বউদি। বউদি।

এ কি ভৌতিক কিছু ঝিনুক?

না, না, একদম তা নয়। আসলে আপনার ওই নদীর মতোই এও এক মৃত্যুর হাওয়া। বেঁচে থাকতে আর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে অত ভালবাসত নীলু, অথচ সে-ই তো মরে গেল! তাই বোধহয় এই হাওয়াটা এসে আমাকে বলতে চাইত, তোমরা কেন বেঁচে আছ? তোমাদের বেঁচে থাকার কী অধিকার? যে পৃথিবীতে নীলু থাকতে পারল না, সেই পৃথিবীতে তোমরাই বা থাকবে কেন? জানেন, সেই সময়ে আমার বেশ কয়েকবার সুইসাইড করতে ইচ্ছে হয়েছে।

বৈশম্পায়ন আস্তে জিজ্ঞেস করল, নীলু সম্পর্কে তুমি কি সবটুকু জানো ঝিনুক?

ঝিনুক স্থির হয়ে সামনের নির্মীয়মান একটি ফ্ল্যাটবাড়ির কাঠামোর মধ্যে ঘনীভূত অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল, নীলুর সবটুকু কে-ই বা জানে! তবে ও মরে যাওয়ার পর আমার যখন ওরকম মানসিক অবস্থা, তখন একদিন খুব বিরক্ত হয়ে মাধব বলেছিল, নীলু ওর ভাই নয়।

বৈশম্পায়ন একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল। ঝিনুক জানে।

ঝিনুক মাথা নুইয়ে বলে, জানলাম নীলু ওদের বাড়িতে সেই ছোট্টবেলায় এসেছিল। চাকরের কাজ করত। বাপের পদবি জানা ছিল না বলে মাধবদের পদবি নেয়। একটু বড় হওয়ার পর যখন দেখা গেল যে, সে অত্যন্ত মেধাবী আর বুদ্ধিমান তখন মাধবদের বাড়ির লোকেরা ওকে বাড়ির ছেলে হিসেবে পরিচয় দিত। পরে সে বাড়ির ছেলেই হয়ে ওঠে। মাধব আজও নীলুকে ভাই বলে মানে। এসব জানি মন্টু।

.

১৫.

দিদির বাসার সামনে ফুটপাথে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ, টিনের সুটকেসটা পাশে নামানো।

মদনকে দেখে দু'পা এগিয়ে এসে স্নান একটু হেসে বলল, দু'ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

ভিতরে গিয়েই তো বসতে পারতে।

ভিতরে অনেক লোক। জায়গা নেই। আমি আজই দিল্লি রওনা হচ্ছি।

গৌরীর আজ দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু মদন সে কথা জিজ্ঞেস করল না। গৌরী কেন পালাচ্ছে তা সে খানিকটা জানে। শুধু বলল, একা পারবে?

পারব। গরিবরা সব পারে।

গিয়ে কোথায় উঠবে?

আমার এক দূর সম্পর্কের দিদি থাকে কলকাজির কাছে। সেখানে উঠব।

বাচ্চারা?

নিচ্ছি না। দিদির বাসায় কীরকম রিসেপশন পাব জানি না তো! বাচ্চারা সঙ্গে থাকলে অসুবিধে।

মা ছাড়া ওদের অসুবিধে হবে না?

ওরা মাকে থোড়াই কেয়ার করে।

তোমার কষ্ট হবে না?

গৌরী একটু হাসল, মানুষ তো! একটু হবে! তবে সেটা সহ্য করা যাবে। ওসব সেন্টিমেন্ট নিয়ে আপনি ভাবলেন না। আমি এখন পালাতে চাই। পরে সুযোগ-সুবিধে বুঝে ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাব।

চারদিকে আজকাল খুব বউ পালাচ্ছে। খুব দুশ্চিন্তার কথা। মদন ফিচেল হাসি হেসে বলে, আর নবর জন্য মন কেমন করবে না? নব যদি বাড়ি ফিরে দেখে, তুমি নেই, তা হলে?

গৌরী কেমন বিবশ হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, কার জন্য এতকাল মন কেমন করেছে তা কি এম পি সাহেব জানেন?

না। কার জন্য গৌরী?

দিল্লিতে গিয়ে বলব।

নবর কাছে আর কখনও ফিরে আসবে না গৌরী?

নব আমার কে? ওর কাছে ফিরে আসব কেন?

নব যদি ভাবে তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে গেছ?

আমি কার সঙ্গে পালালাম তাতে ওর বড় বয়েই গেল।

তা ঠিক। তবে প্রেস্টিজের ব্যাপারও তো আছে। বউ পালালে কোনও পুরুষ খুশি হয়?

আমি তো চাকরি করতে যাচ্ছি। পালাচ্ছি কে বলল?

তুমিই তো এইমাত্র বললে!

সে আপনার কাছে সত্যি কথাটা বললাম, ওর বাড়ির লোক অন্যরকম জানে।

মদন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে গেল।

গৌরী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কিচ্ছু জটিল হয়নি মদনদা। এটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে। আপনি চলে আসার পর আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম।

মদন ফিচিক করে হেসে বলে, বুড়ি তোমাকে খুব ধোয়াচ্ছিল।

আপনিই তো দুষ্টুমি করে লাগিয়ে দিয়ে এলেন। তবে ওসব শুনতে শুনতে আমার অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ সব অন্যরকম হয়ে গেল। পাষাণী অহল্যাকে জাগাতে রামচন্দ্র এলেন। আজ আপনি যেই গেলেন অমনি ভিতরে সব ঘুমন্ত বোধ জেগে উঠল। দুঃখ, অপমান, হতাশা, সেইসঙ্গে ভালভাবে বাঁচার ইচ্ছে। অন্ধকারে থেকে থেকে আলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ আলো দেখে বুঝতে পারলাম, কী অন্ধকারেই না পড়ে আছি।

আমি কি তোমার আলো গৌরী? আবার রামচন্দ্রও?

গৌরী এই প্রকাশ্য ফুটপাতে, চারদিকে চলন্ত লোকজনের ভিড়েও কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। আবেগে ঠোঁট কাপল, গলা রুদ্ধ হয়ে গেল। কোনওক্রমে বলল, আলো! আপনি ছাড়া আমার জীবনে আর কোনও আলো নেই।

এ কথায় খুব হোঃ হোর করে হাসতে ইচ্ছে করছিল মদনের। বদলে সে আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল। মৃদুস্বরে বলল, তোমার জীবনে আর একটা আলো ছিল গৌরী। আমি জানি।

গৌরীর স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখ থেকে স্বপ্নের ক্রিমটুকু কে মুছে নিল। একটা ঢোক গিলল সে। মাটির দিকে চেয়ে বলল, আপনি কখনও অতীতকে ভোলেন না কেন এম পি সাহেব?

মদন তেতো একটু হেসে বলে, ভুলতে পারি না গৌরী। আমার যে কেন সব মনে থাকে! আর তার জন্যই মাঝে মাঝে কষ্ট পাই।

গৌরী যখন মুখ তুলল তখন তার চোখ ছলছল করছে। একটু ধরা গলায় বলল, আপনি কি এখনও নীলুকে হিংসে করেন? আমার জন্য?

মদন গম্ভীর গলায় বলে, নীলুকে হিংসে করব কেন গৌরী? নীলুর এমন কী ছিল যাকে হিংসে করা যায়?

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, আমিও তো তাই ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। নীলু কোনওদিন আমাকে ফিরেও দেখেনি। নীলুকে কেন আপনি হিংসে করবেন?

মদন মাথা নেড়ে বলে, নীলুকে হিংসে করি না গৌরী, শুধু জীবনের সত্য দিকগুলির দিকে তোমার চোখ ফিরিয়ে দিতে চাই। তোমার জীবনের আলো ছিল নীলু। বিয়ে করার জন্য তাকে তুমি অনেক জ্বালিয়েছ। বিষ খাবে বলে ভয় দেখিয়েছ। নীলুর ওপর শোধ নিতেই কি তুমি নবর সঙ্গে ঝুলেছিলে? নীলু অন্তত তাই বলত।

ওসব কথা থাক মদনদা। আজ থাক। নীলু তো বেঁচে নেই।

মদন একটু হাসল, আস্তে করে বলল, কিংবা হয়তো খুব বেশি বেঁচে আছে।

নীলুর জন্য আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে মদনা, সে আমার আলো হবে কেন?

মদন চুপ করে রইল। মুখটা গম্ভীর।

গৌরী হঠাৎ নিচু হয়ে তাকে একটা প্রণাম করে বলল, আমার গাড়ির সময় হয়ে গেছে। আমি আসি।

টিনের সুটকেসটা তুলে নিয়ে গৌরী নিরাশ্রয় অসহায়ের মতো যখন রাস্তাটা পেরিয়ে গেল তখন মদনের ভারী কষ্ট হল গৌরীর জন্য।

এতক্ষণ এম পি ছিল না মদন, দিদির বাসার বাইরের ঘরে পা দিয়েই হল। কণা নামে একজন মহিলা বসে আছেন। স্বামী দুশ্চরিত্র। ঘ্যানর ঘ্যানর অনেক কথা শুনে যেতে হল তাকে। আশ্বাস দিল গিয়েই ব্যবস্থা করবে।

সারাক্ষণ ভারী ক্লান্ত লাগছে তার। স্কচের বোতল খুলে বসে আছে মাধব। গিয়ে এক্ষুনি ডুব দিতে হবে। সব ভুলে যেতে হবে, ভাসিয়ে দিতে হবে। সে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। তারপর জামাকাপড় পালটে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরল একটা।

.

সহদেব বিশ্বাস তার ওকালতির চেম্বারে চেয়ারে হাঁটু তুলে বসা, মাথায় টাক, মুখে ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি। খুব পসারের সময়েই ওকালতি ছেড়ে দিয়েছে। এখন কালেভদ্রে উপরোধে বা পার্টির দরকারে কেস করে। তার চেয়ারের দু'ধারে কেঁদো বাঘের মতো দুই রুস্তম বসে আছে। তাদের গায়ের টি শার্ট ছিড়ে শরীরের মাসল ঠিকরে বেরোচ্ছে, মুগুরের মতো হাত, খোলা জামা দিয়ে বুকের ঘন লোম দেখা যাচ্ছে। দু'জনেরই চোখ নবর দিকে স্থির।

দুজনকেই চেনে নব। বেলেঘাটার বিখ্যাত মস্তান যমজ দুই ভাই কেলো আর বিশে। দিনকাল পালটে গেছে, এখন মস্তানরা লিডারদের দেখে, লিডাররা দেখে মস্তানদের। কিন্তু ফালতু ব্যাপারে নবর মনোোযোগ দেওয়ার সময় নেই। তিন জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে সে সহদেব বিশ্বাসের কাছে আসতে পেরেছে।

সহদেব মৃদু স্বরে কথা বলছিল। শোকতাপা মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো গলায়। নব অবশ্য সান্ত্বনা পাচ্ছে না। সহদেব বলল, এ সময়ে পলিটিক্যাল শেলটার দেওয়ার অনেক ঝুঁকি আছে হে নব। আজই পার্টির মিটিং-এ বিরাট ব্যাপার হয়ে গেছে। আজ হোক, কাল হোক, দল ভাঙছে। স্টেট সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, আরও অনেক লিডার রেজিগনেশন দিয়েছে। এখন আমরা রিস্ক নিতে চাই না।

রিস্ক কীসের?

তুমি কনডেমনড খুনি। শেলটার দিলে হাজার রকমের প্রশ্ন উঠবে।

কিন্তু পুলিশ তা হলে আমাকে পালাতে দিল কেন?

সহদেব বিচক্ষণ একটু হেসে বলে, কথাটা দু’বার বললে, ওটা তোমার ভুল ধারণা। পুলিশ তোমাকে পালাতে দেয়নি। কোনও কারণে গার্ডরা অন্যমনস্ক ছিল। তুমি সেই সুযোগটাকেই মনে করছ গটআপ ব্যাপার।

নব কথা না বাড়িয়ে অধৈর্যভাবে কাধ কঁকিয়ে বলে, ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমি কী করব?

গা ঢাকা দিয়ে থাকো যদি পারো।

কতদিন?

যতদিন না ভাঙচুরটা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে।

নিত্যদার কাছে গেলে কিছু হবে?

নিত্যদা খুব ব্যস্ত। আজ রাতেই বোধহয় উনি পার্টির সেক্রেটারি হচ্ছেন। মিটিং চলছে। তোমাকে সময় দিতে পারবেন না।

আমার সঙ্গে পার্টির যে লোক দেখা করেছিল জেলখানায়, যে বলেছিল–

সহদেব সহজে ধৈর্য হারায় না। এখনও হারাল না, মৃদু হাসি হেসে বলে, সে কেন দেখা করেছে তা সে-ই জানে। দল থেকে তাকে পাঠানো হয়নি।

নব টেবিলে ভর রেখে ঠান্ডা গলায় বলে, আপনি তো জানেন পলিটিক্যাল শেলটার না পেলে পুলিশ আমাকে কুকুরের মতো খুঁজে বের করবেই। এ বাজারে পলিটিক্যাল পার্টি ছাড়া কেউ আমাকে কোনও প্রাোটেকশন দিতে পারবে না। আপনি এও তো জানেন সহদেবদা, আমি মাগনা প্রাোটেকশন চাইছি না। কোনও শালা কখনও আমার জন্য মাগনা কিছু করেওনি। প্রাোটেকশন দিলে কাজ করে দেব, দরকার হলে লাইফের রিস্ক নিয়েই।

কেলো আর বিশে তাকাতাকি করে নেয়। তারপর আবার নবর দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকে।

সহদেব হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে, সবই জানি। কিন্তু শেলটার বা প্রাোটেকশন কোনওটাই দেওয়া এখন সহজ নয়। আমাদের সময়টা খারাপ যাচ্ছে।

নব ধৈর্য হারাচ্ছিল। সে বেশিক্ষণ গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। বেশি কথা বলার দমও তার নেই। একটু গরম হয়ে বলে, নীলু হাজরার কেসটায় আমাকে ফাসানো হয়েছিল, আপনি জানেন? নীলুকে আমি মারিনি।

কেলো আর বিশে আর-একবার তাকাতাকি করে, চোখের কোণ দিয়ে সেটা লক্ষ করে নব।

সহদেব নির্বিকারভাবে জিজ্ঞেস করে, কে তোমাকে ফাসিয়েছিল?

নাম বলে লাভ কী? আপনারা তো জানেন।

সহদেব বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, তাতেও আমাদের কিছু করার নেই।

নব একটু হেসে বলে, করার অনেক আছে, কিন্তু আপনারা করবেন না। ঠিক আছে, আমি আমার। রাস্তা করে নেব।

বলে নব ওঠে। সহদেব নিজের হাতের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরা জয় তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে ক্লান্তি, চোখে ভয়। ইচ্ছে করলে সে নবর হাত এড়িয়ে এতক্ষণে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে এও জানে, পালিয়ে কোনও লাভ নেই। নব তাকে খুঁজে বের করবেই।

জয় বলল, কিছু হল?

নব রক্তঝরা চোখে চেয়ে বলল, খানকির ছেলেরা ফেঁটা কেটে বোষ্টম সাজছে।

তোমার সঙ্গে জেলখানায় যে দেখা করেছিল তাকে তুমি ঠিক চেনো?

আলবত। শালা কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল!

দু’ জনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেই পেছন থেকে কেলো বেরিয়ে এসে সোডার বোতল খোলার মতো শিসটানা গলায় ডাকল, নব।

নব ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো ঘুরে দাঁড়ায়।

কেলো পাহাড়ের মতো দরজায় দাঁড়ানো। কোমরে হাত, এরকম বিশাল চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, শোন।

নব সতর্কভাবে কাছে এগিয়ে যায়, কী বলছ?

কথা আছে।-বলে নবর একটা হাত শক্ত করে ধরে ভিতরে নিয়ে যায়।

ঘরে এখন সহদেব নেই। শুধু কেলো আর বিশে। বিশের হাতে খোলা ছ'ঘরা রিভলবার।

কেলো রুমাল দিয়ে টাকের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, একটা কাজ আছে। কিন্তু এর মধ্যে পার্টি নেই।

প্যাঁচ মেরো না। কেস করতে হবে তো? বললা। কিন্তু তার আগে বলো, শেলটার দেবে কি না।

কেসটা কর। দেখা যাবে।

তোমাদের কথায় হবে না। আমাকে কোনও লিডারের সঙ্গে লাইন করে দাও।

লিডাররা এর মধ্যে নেই।

সহদেবদা নিজের মুখে বলুক তা হলে।

সহদেবদা বলবে না। আমরাই বলছি। রাজি থাকলে বল, না হয় তো কেটে পড়।

নব করাল চোখে দুই যমজ ভাইকে দেখে নিল। আপাতত তার কিছু করার নেই। তারা উভয়পক্ষই যে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় তাতে কেউ কাউকে ফালতু ভয় খেয়ে সময় বা শরীর নষ্ট করে না। কাটে কাটে পড়ে গেলে কে কার লাশ নামাবে তার কোনও ঠিক নেই। তবে নব একটু টাইট জায়গায় আছে বটে। সে বলল, ফালতু বাত ছাড়ো কেলোদা, কেস আমি করে দেব, সে তোমরা জাননা। কিন্তু তারপর কী?

কেলো নির্বিকারভাবে বলে, কেস হয়ে গেলে বাড়ি গিয়ে বসে থাকবি।

বাড়িতে লালবাজারের খোঁচড়েরা নেই?

অন্য জায়গায় তোর ঠেক আছে?

আছে।

তা হলে সেইখানেই চলে যা। পরশু পার্টি অফিসে দুপুরের পর দেখা করিস।

কিছু মালকড়ি ছাড়ো কেনোদা।

কেলো একটু হাসল, তুই মালকড়ি ছাড়া নড়বি না তা জানি। বোস, ব্যাপারটা বুঝে নে। সঙ্গের ছোকরাটা কে?

ফালতু। কেলো একটু গম্ভীর মুখ করে মোটা আঙুল মুখে পুরে সঁতের ফাঁক থেকে বোধহয় দুপুরের খাওয়া মাংসের আঁশ বের করে আনল। তারপর চোখ ছোট করে বলল, বিশে বলবে। শুনে নে।

১৬-১৮ অনেক দুঃখের কথা

১৬.

অনেক দুঃখের কথা বলে কণা বিদায় নেওয়ার পর চিরু মণীশের কাছে এসে বলে, তোমার কি মনে হয়, মদন কিছু করতে পারবে কণার জন্য?

মণীশ নিবিষ্টমনে সিনথেটিক আঠা দিয়ে একটা ভাঙা কাপ জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছিল ভিতরের বারান্দায়। বলল, একটা চরিত্রহীন মানুষকে চরিত্রবান করার সাধ্য তো আর ওর নেই। তবে ভয় দেখাতে পারে বটে। চাকরিরও ক্ষতি করতে পারে হয়তো।

তাতে কিছু হবে?

ঠোঁট উলটে মণীশ বলে, আমার মনে হয় না। তা ছাড়া মদনও যে কিছু করবেই এমন ভাবছ কেন? হয়তো দিল্লি গিয়ে ভুলে যাবে। তেমন গা করছিল না।

একটু আনমনা ছিল, আমিও লক্ষ করেছি। ওদের পার্টিতে কী সব গোলমাল চলছে না?

তা চলছে। কাপটা জোড়া দিয়ে দুহাতে জোরসে চেপে ধরল মণীশ, তারপর ওই অবস্থাতেই বলল, শালাবাবু আজ একটু তরল জিনিস চালিয়ে আসবে। মাধবের বাড়িতে নেমন্তন্ন যখন।

কত মাথার কাজ করতে হয়, কত ঝামেলা ওর। একটু খায় খাক। কখনও মাতলামি করে না তো। চিরু ভালমানুষি গলায় বলে।

মণীশ কাপটাকে প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করে। সিনথেটিক আঠার নিয়মে লেখা আছে, অ্যাপলাই ম্যাকসিমাম প্রেশার। দাতে দাত চেপে সে বলে, আমি এক-আধদিন খেয়ে এলে কী করবে?

এসো না! নতুন অভিজ্ঞতা হোক, আমিও মরার আগে নিজের চোখেই দেখে যাই। বলে চিরু চোখ পাকিয়ে তাকায়।

মণীশ মৃদু হেসে বলে, তোমার স্বামী না হয়ে যদি ভাই হতাম চিরু, অনেক অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যেত।

চাপটা একটু বেশি হয়ে যাওয়াতেই বোধহয়, কাপের ভাঙা টুকরো দুটো পিছলে খুলে গেল। মণীশ বলল, এঃ। আজকাল কিছুই সহজে জোড়া লাগতে চায় না কেন বলো তো?

ওই ভাঙা কাপ জুড়ে আমার কোন শ্রাদ্ধে সুজ্যি সাজাবে শুনি?

আহা, কত সময় দাড়ি-টাড়ি কামানোর জল নিতেও তো লাগে। থাক না জিনিসটা। এই কাপের এখন চুয়ান্ন টাকা ডজন।

বলে মণীশ আবার আঠা লাগিয়ে ভাঙা টুকরো দুটো জুড়তে থাকে।

চিরু বলে, এ হল পেতনামি। দিন দিন তোমার নজর ভারী ছোট হচ্ছে।

দিন দিন দেশের অবস্থাও খারাপ হচ্ছে যে। তোমার এম পি ভাইও কথাটা স্বীকার করে। বাজারহাট তো কখনও করলে না মিস্টার, তাই টেরও পেলে না।

চিরু যেন একটু রাগ করেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। স্টোভে ভাত ফুটছে, সেইদিকে চেয়ে থাকে চুপচাপ। ছেলেমেয়েরা শোওয়ার ঘরে গুনগুন করে পড়ছে। শব্দটা শুনতে শুনতে কত কী ভাবতে থাকে।

কাপটা অধ্যবসায়ের বলে জুড়তে পেরে যায় মণীশ। বেসিনে আঠা লাগানো হাত ধুয়ে লুঙ্গিতে মুছতে মুছতে খুব সাবধানে রান্নাঘরের ভিতরে উকি দিয়ে মৃদু স্বরে ডাকে, চিরু।

চিরু ঠান্ডা গলায় বলে, বলো।

একটা কথা বলব?

শুনতে পাচ্ছি। বললেই হয়।

তুমি কি রাগ করেছ?

রাগ করা কি আমার সাজে?

রাগের তো সাজগোজ লাগে না মিস্টার।

তবু বাঁদিদের রাগ তো মানায় না।

সেই পুরনো শব্দ। নতুন কিছু ভেবে বার করতে পারো না?

আমার অত মাথা নেই, জানোই তো?

মণীশ চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে, শুধু ইয়ার্কি করে এই গাঢ় মেঘ কাটানো যাবে না। চিরুর সঙ্গে তার বোঝাপড়া চমৎকার তবু মাঝে মাঝে চিরুর একরকম গভীর অভিমান হয়। খুব সামান্য কারণেই হয়। সহজে ভাঙে না।

আবার যখন 'চিরু' বলে ডাকল মণীশ তখন তার গলার স্বর পালটে গেছে।

চিরু তবু তাকায় না। গোঁজ হয়ে স্টোভের দিকে চেয়ে থাকে।

মণীশ অত্যন্ত ঘন হয়ে ওঠা গভীর মৃদু স্বরে বলে, যা তোমাকে কখনও বলতে ইচ্ছে করে না। আজ তার কয়েকটা কথা বলব?

চিরুর মনোভাব বোঝা গেল না। কিন্তু সে জবাবও দিল না।

মণীশ মৃদু স্বরেই বলল, এত বয়স পর্যন্ত আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। না একটা বাড়িঘর, না স্থায়ি নিরাপত্তার কিছু না কোনও শখ-শৌখিনতার জিনিস। আশেপাশে সব বাড়িতেই যা যা আছে, তার কিছুই আমার নেই।

চিরু এবার বিস্ময়ভরে তাকিয়ে বলে, এসব কথা উঠছে কেন?

উঠছে তোমার জন্য নয়। আমি আজকাল নিজেই ভেবে দেখি, অনেস্ট থাকার চেষ্টা করে আমি পাঁঠার মতো কাজ করলাম কি না। আমি আজ মরে গেলে কাল যে তোমাদের পঁাড়ানোর জায়গা থাকবে না।

চুপ করো।

মণীশ একটা বড় শ্বাস ফেলে বলে, এ রাগ বা অভিমান থেকে বলছি না চিরু। যা ফ্যাক্ট তাই। বলছি। আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারি না, এই সমাজের সঙ্গে পাল্লা টেনে চলাই উচিত ছিল কি না।

চিরু নরম হয়েছে। জলচৌকিতে বসে মণীশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তাবপর বলল, তুমিঅনেস্ট বলে আমি কখনও কিছু বলেছি? না চেয়েছি?

চাওনি? বলোনি। তবু মনে মনে তো মানুষের কত প্রত্যাশা থাকে। তেমন বেশি প্রত্যাশাও নয়। একটু জমি, ছোট বাড়ি, কিছু টাকা, কয়েকটা শৌখিন জিনিস।

চিরু অন্যমনস্ক হয়ে মৃদু স্বরে বলল, মাঝে মাঝে এসব নিয়েও ভাবি, কিন্তু তোমার ওপর রাগ করি না তাই বলে। এই যে কণা এসেছিল, আমার বাড়িঘর দেখেটেখে আজ বলল, তোর বর কাস্টমসের অফিসার, অথচ তোর ঘরে একটাও ফরেন জিনিস নেই। ভারী আশ্চর্য। একটা রেডিয়ো না, টেপ রেকর্ডার না, বিদেশি শাড়ি, সেন্ট ঘড়ি কিছু না। অথচ পাবলিক কত ফরেন জিনিস কিনছে চারদিকে।

শুনে তোমার মন কীরকম হল?

একটু খারাপ লাগল। কথাটা তো মিথ্যে নয়।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, মিথ্যে নয়। তাই ভাবি, অপদার্থতার আর এক নামই সততা কি না।

তা কেন হবে? তবে মদনও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, জামাইবাবুর সততা আর শুচিবাইতে তফাত নেই। সৎ কেন থাকবে না? তা বলে ভাঙা কাপ জোড়া লাগানোর মতো গরিবও তুমি নও।

মণীশ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে হাসল, ও, ওই ব্যাপারটায় তুমি এত রেগে আছ?

চিরু ছলছলে চোখ করে বলে, তোমাকে ওসব উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখলে আমার এমন কষ্ট হয়!

আরে দূর! কাপটা না হয় এক্ষুনি ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি।

কাপটা তো বড় কথা নয়। মনটাকে ছুড়ে ফেলতে পারবে কি?

মণীশ মলিন একটু হাসল। বলল, উঁচু দরের সাহিত্যের ডায়ালগ দিলে মিস্টার।

ইয়ার্কি কোরো না। আমি তোমাকে জব্দ করার জন্য কথাটা বলিনি। আজ আমার মনটা খারাপ।

বুঝেছি চিরু। মনটা আমারও ভাল নেই। কেবলই মনে হচ্ছে, সংসার আমার কাছে আরও কিছু চেয়েছিল। মুখ ফুটে চায়নি ঠিকই কিন্তু প্রত্যাশা নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আর সংসার যা চাইছে তা হয়তো আমার দেওয়া উচিত। কিন্তু একটা ভ্রান্ত উচিত-অনুচিত সৎ-অ‌াতের বোধ সব গোলমাল করে দেয়। বুঝি এর কোনও দাম নেই...।

চিরুর আঁচল-চাপা অবরুদ্ধ কান্নার শব্দে থামে মণীশ। গলার কাছে তারও একটা কান্নার দলা ঠেকে আছে বহুদিন। কিন্তু সে তো পুরুষমানুষ! তাই কাঁদল না। একটু হাসল মাত্র। কিন্তু ঠিক করোটির হাসির মতো লাবণ্যহীন দেখাল তার মুখশ্রী।

রান্নাঘরে চৌকাঠে দুই হাত রেখে সে ঝুঁকে পড়ল ভিতরে। চাপা গলায় বলল, বাচ্চারা শুনতে পাবে। কেঁদো না। কান্নার মতো কিছু তো হয়নি।

চিরু কান্না আর আক্রোশে চাপা গলায় ফেটে পড়ল, কথায় কথায় তুমি আজকাল মরার কথা বলো কেন?

বলি আর কিছু করার নেই বলে চিরু। সৎ থাকার চেষ্টা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, পরের পয়সায় একটা পান খেতে গেলেও দু'বার ভেবে দেখি, এর মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না। অথচ এই নিরন্তর সৎ থেকে থেকেও আজকাল কেমন সততার মধ্যে কোনও শক্তি পাই না।

তোমাকে কেউ অসৎ হতে বলেছে?

মণীশ মাথা নাড়ে, বলেনি, অন্তত তুমি কোনওদিন বলোনি। সে কথা নয়। আমি বলছিলাম সততা, সচ্চরিত্র এগুলোই তো মানুষের শক্তির উৎস। তবু আজকাল আমি সততা থেকে কোনও জোর পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয় ভুল করেছি। সৎ বলে সারাজীবন মানুষের ঠাট্টা বিদ্রুপ তো কম সহ্য করিনি। আগে গায়ে লাগত না। আজকাল লাগে।

সৎ থেকেও কেউ ভাল নেই?

আছে নিশ্চয়ই। কে খুঁজে দেখেছে বলো? আমার প্রশ্ন তাও নয়। আমি আজকাল সততা জিনিসটা কতদূর প্রয়োজন তাই নিয়ে ভাবি।

ইচ্ছে করলে মদন তোমাকে অনেক কিছু করে দিতে পারে। ওর অনেক ক্ষমতা। তোমাকে সততা বিসর্জন দিতে হবে না।

জানি চিরু। একজন এম পি যে অনেক কিছু পারে তা না বুঝবার মতো ছেলেমানুষ আমি নই। ভেবে দেখো, আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন ও একটুখানি ছেলে। আমাদের বিয়ের পর ওর পইতে হল। সেই শ্বশুরমশাইয়ের অনুরোধে পইতেয় ওকে গায়ত্রীমন্ত্র দিয়েছিলাম আমি। বলতে কী আমিই ওর আচার্য। এখন ও হয়তো গলায় পইতেই রাখে না, কিন্তু ব্যাপারটা আমি ভুলি কী করে? সেই মদন এখন এম পি, হাজারজনা এসে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে, সবই জানি। কিন্তু উমেদারদের দলে নিজের নামটা লেখাতে রুচিতে বাধে।

চিরুর কান্না থেমেছে। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে।

তারপর বলল, আমি তোমাকে আর কখনও কিছু বলব না। বাইরের ঘরে সোফার নীচে বাসন্তী ঘুমোচ্ছ। ওকে ডেকে দাও তো। একটু পোস্ত বেটে দেবে।

মণীশ নড়ল না। তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আজ তোমার অভিমান ভাঙিয়ে মুখে হাসি ফোটাতে পারলাম না চিরু। বিবাহিত জীবনের এই প্রথম ফেইলিওর। আমাদের চোখের সামনে মদন এক মস্ত প্রলোভনের মতো। কেবলই মনে হয়, হাতের মুঠোয় একজন ক্ষমতাবান এম পি, ইচ্ছে করলেই কত কাজ আদায় করে নিতে পারি। মনে হয় না চিরু?

চিরু জবাব দিল না। হাতায় করে ভাত তুলে টিপে দেখল।

মণীশ বাইরের ঘরে এসে বাসন্তীকে ঠেলে তুলে দেয়।

জোড়া-দেওয়া কাপটা এখনও তার হাতে। বাতিটা নিভিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে সোফায়। পোযা বেড়ালের গায়ে লোকে যেমন হাত বোলায় তেমনি আদর করে সে কাপটার গায়ে হাত বোলাতে থাকে। একেবারে আস্ত কাপের মতো জোড়া মিলে গেছে।

তবু ঠাহর করে আঙুল বোলালে জোড়ের জায়গাটা বোঝা যায়। খুব ঠাহর করলে, নইলে না।

সাবধানে মণীশ কাপটা সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে দেয়।

অন্ধকারে বসে মণীশ ভাবল, আজ রাতে যদি আমি মরে যাই তা হলে কি সংসার ভেসে যাবে? আমার বাচ্চারা কোনওদিন দাঁড়াবে না? পরের দয়ায় বাঁচতে হবে সবাইকে? যদি তাই হয় তা হলেই বা কী করতে পারে মণীশ? চিরু বা বাচ্চারা তারই বউবাচ্চা বটে, কিন্তু যতদিন বেঁচে আছে। ততদিন। তারপর এই প্রকৃতি, এই দেশ, এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ও এই সমাজ থাকবে। কী হবে তা মণীশ জানে না, কী হবে তা স্থির করার মালিক সে তো নয়। তবে সে এটুক বোঝে পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয়। তাকে ছাড়াও চলবে হয়তো, কিন্তু চলবে। কোনও শূন্যস্থান অপূরণ থাকে না।

মণীশ জানে, মদন হচ্ছে তার হাতের নাগালে এক আশ্চর্য প্রদীপ, যাতে ঘষা মারলেই এক বিশাল দেনেওয়ালা দৈত্য এসে হাজির হবে। কোনওদিনই প্রদীপটাকে ঘষবে না মণীশ। কিন্তু সংসার চাইছে, সে প্রদীপটাকে ঘষুক। একটু ঘষুক।

মণীশ অন্ধকার ঘরে বসে ভাবল, আজ রাতে যদি মরে যাই?

ভেবে একা একা একটু হাসল মণীশ। সেই করোটির হাসিব মতো লাবণ্যহীন এক হাসি। আজ রাতে তার খুব মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

.

১৭.

মাধব দরজা খুলতেই মদন প্রথম প্রশ্ন করল, ঝিনুক ফিরেছে?

মাধব আধো-মাতাল গলায় বলল, আয়, আয়। ঝিনুক? না, ঝিনুক ফিরবে না। ঝিনুক কেন ফিরবে বল তো?

মাধব ঘরে ঢুকে দেখে, সেন্টার টেবিলের ওপর একটা বোতল খালি পড়ে আছে, আর একটার সিকিভাগও উড়ে গেছে।

বোস। খা–বলে মাধব একটা গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢেলে বরফের বার থেকে চিমটে দিয়ে তুলে বরফ মেশাল। বলল, দেখ, কী সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছিল ঝিনুক। কত খুঁজে খুঁজে সব জিনিস কিনেছে, কত যত্নে সাজায়, ঘোয় মোছে। কিন্তু তবু ঘর ভেঙে দেওয়া কী সোজা দেখলি? এক মিনিটও লাগে না।

মদন গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে 'আ'বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ঘর ভাঙা যে কত সোজা সে কি তুই আমাকে শেখাবি রে মাধব? আমার চেয়ে ভাল তা আর কে জানে? আজ আমি পার্টিতে রেজিগনেশন দিয়েছি, জানিস?

দিলি? অ্যাঁ!

দিলাম! কেন দিতে হল জানিস? আমার খুব খিদে পেয়েছিল বলে। বাচ্চা ছেলেরা ঘেরাও করেছিল, বেরোতে পারছিলাম না। ওরা বললে, রেজিগনেশন লেটারে সই করলে বেরোতে দেবে। আমি তাই দিয়ে দিলাম। অথচ এই পার্টির সঙ্গে কতকাল আছি! শূন্য গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মদন বলে, দে।

অত তাড়াতাড়ি খাস না। হুইস্কি ইজ এ স্লো ড্রিংক।

সো আব অল ড্রিংকস। কিন্তু অত সব প্রাোটোকল মানার মেজাজ নেই রে। দে।

আগের বারের বরফের টুকরোগুলো গলবার সময় পায়নি মদনের গ্লাসে। তার ওপরেই আবার হুইস্কি ঢেলে দিল মাধব। মদন উঁকি মেরে দেখল, সেন্টার টেবিলের নীচের থাকে

আরও দুটো বোতল বরফের ট্রেতে শোয়ানো। দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বলে, তুই তো বলেছিলি, ছোট করে হবে। কিন্তু এ যে দেখছি, পুরো শুঁড়িখানা খুলে বসেছিস।

ছোট করেই কথা ছিল। কিন্তু কথা কি রাখা যায়, বল? কথা কি ছিল, এই বয়সে আমাকে একা ফেলে ঝিনি চলে যাবে? বল, দুনিয়ায় কোনও কথা থাকে?

মদন হাত বাড়িয়ে বলে, চিঠিটা দে।

মাধব একটু পিছন দিকে হেলে সভয়ে বলে, কীসের চিঠি?

কেন, ঝিনুক কোনও চিঠি লিখে রেখে যায়নি?

না তো? চিঠি লিখবে কেন? আঁ! চিঠি লেখার কোনও মানে হয়?

চিঠি লিখে রেখে যায়নি তো কী করে বুঝলি যে, ও পালিয়েছে?

বোঝা যায়। দেখছিস না, ঘরদোর কেমন খাঁ খাঁ করছে। অবশ্য তুই ঠিক বুঝবি না। ঝিনির সঙ্গে থাকলে বুঝতিস। আমি তো ঘরে পা দিয়েই

তোদের ঝি-টাকে ডাক।

ঝি? তাকে কেন?

ডাক না।

ওঃ, জ্বালালি। পুনম। এই পুনম।

পুনম দৌড়ে আসে, মামাবাবু, ডাকছ?

মদন জিজ্ঞেস করে, ঝিনুক কখন বেরিয়েছে?

চারটে-পাঁচটা হবে। তখনও রোদ ছিল।

কোথায় গেছে বলে যায়নি?

জি। বোনের বাড়ি। কাছেই।

সঙ্গে কেউ ছিল?

ওই এক মামাবাবু এসেছিল, কী যেন শক্ত নামটা

বৈশম্পায়ন?

জি। আর একটা নতুন কাজের মেয়েও ছিল।

কেন?

বোনের বাড়ি মেয়েটাকে দেওয়ার কথা।

আচ্ছা, তুমি যাও।–বলে মদন মাধবের দিকে চেয়ে বলে, একটি লাথি কষাব তোমাকে শালা।

মাধব মাথা নাড়ে, তুই বুঝবি না। ঝি, বোনের বাড়ি, সব ঠিক। কিন্তু তবে বাড়িটা এত খাঁ খাঁ করছে কেন? তুই টের পাচ্ছিস না?

খাঁ খাঁ নয়। বাড়িটা তোকে বলছে, খা খা আরও হুইস্কি খা।

দূর! এ বাড়ির একটা অদ্ভুত বাতাবরণ আছে! যাকে বলে অ্যাটাোসফিয়ার। আজ সেটা অ্যাবসেন্ট। ভীষণরকম ভাবে অ্যাবসেন্ট। আমি অনেক চেষ্টা করলাম খুঁজতে। অ্যাটমোসফিয়ারটা কিছুতেই রেসপন্ড করছে না। ইট ইজ নট হিয়ার।

মদন গ্লাস নামিয়ে বলল, দে।

এবারও তার প্রথমবারের বরফ গলার সময় পায়নি। মাধব চোখ বড় বড় করে বলে, এরকম টানতে কোথায় শিখলে গুরু? আচ্ছা খা। আজ তোরও দুঃখের দিন। আজ থেকে তুইও তো আর এম পি নোস। শুধু মদনা।

চোখ ছোট করে চেয়ে মদন বলে, আমি মদনা সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি আর এম পি নই এ কথা তোকে কে বলল?

কেন, এই যে বললি রেজিগনেশন দিয়েছিস?

রেজিগনেশন দিয়েছি পার্টি থেকে, কিন্তু তাতে আমার পার্লামেন্টের মেম্বারশিপ যায় না। আই অ্যাম স্টিল ভেরি মাচ অ্যান এম পি।

মাধব খুব অবাক হয়ে বলে, ইউ আর স্টিল অ্যান এম পি? বাঃ বাঃ। হোঃ হোঃ, আফটার ইভন রেজিগনেশন ইউ স্টিল রিমেন এম পি! বাহবা।

দূর গাড়ল! সংবিধানে আটকায় না।

মাধব উচ্চ স্বরে বলে, আলবত আটকায়। আলবত আটকায়। নিশ্চয় আটকায়।

কোথায় আটকায়?

মাধব মিইয়ে গিয়ে বলে, কোথাও নিশ্চয়ই আটকায়। কিন্তু এক্ষুনি সেটা আমি ভেবে পাচ্ছি না। আফটার অল আমার বউ পালিয়ে গেছে, এখন আমার মাথার ঠিক নেই।

কোথাও আটকায় না। আই অ্যাম স্টিল অ্যান এম পি।

মাধব চোখ বুজে মাথা নাড়ে। বলে, তুই এখনও এম পি কী করে? তা হলে এ ম্যান ক্যান বি ভেরি মাচ অ্যালাইভ আফটার হিজ ডেথ! আঁ। এ ডেড ম্যান মে বি কলড অ্যান অ্যালাইভ ম্যান! না কি লজিকটা হচ্ছে না?

তীক্ষ্ণ কূট চোখে চেয়ে ছিল মদন। বলল, দেয়ার ইজ সাম টুথ ইন ইট।

তার মানে?

মরার পবও কেউ কেউ বেঁচে থাকে। দে।

মাধব বোতলটা তুলে দেখে বলে, ফিনিশ? আঁ। তুই অত ধড়াধ্বড় খাস না। আর একটা খুলছি, এবার সোড়া মিশিয়ে খা।

মদন গ্লাসটা এগিয়ে দেয়।

মাধব নতুন বোতল খুলে হুইস্কি ঢেলে দিয়ে বলে, কী বলছিলি? মড়া না জ্যান্ত, কী যেন!

বলছিলাম কেউ কেউ মরেও বেঁচে থাকে।

মাধব হঠাৎ সিটিয়ে গিয়ে বলে, যাঃ মাইরি। এমনিতেই আমার ভীষণ ভূতের ভয়। তার ওপর ঝিনি নেই!

মদন এবার সত্যিই খুব আস্তে খায়। ছোট করে একটিমাত্র চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আর একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর বলে, তোর এত ভয় কবে থেকে মাধব? আর কীসেরই বা ভয়!

ভূত। মেলা ভূত চারদিকে।

কার ভূত রে মাধব?

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফার পিছন দিকে মাথা রেখে পড়ে থাকে। চোখ বোজা, আস্তে আস্তে কখন, কীভাবে তার চোখের কোল ভরে যায় জলে। ঠোঁট একটু কাপে। একটা দীর্ঘশ্বাস অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ে সে।

মাধব।

উ।

এটা তো শোকসভা নয় রে। কিছু বল। নইলে জমছে না।

মাধব বিড়বিড় করে বলে, তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি মানুষের লাশে...

দূর শালা মাতাল!

মদনা, একটা কথা বলবি? লিডার হতে গিয়ে তোকে মোট ক'টা খুন করাতে হয়েছে?

এবার সত্যি লাথি খাবি। যা বাথরুমে গিয়ে পেচ্ছাপ করে ঘাড়ে মুখে ঠান্ডা জল দিয়ে আয়।

মাধব বেকুবের মতো অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, শোওয়ার ঘর থেকে নীলুর ছবিটা আমি সরিয়ে দিয়েছি।

মদন কিছু বলে না। কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ কুর চোখে চেয়ে থাকে।

মাধব রুমালে চোখ মুছে বলে, আফটার অল বাড়ির চাকরের ছবি শোওয়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখার কোনও মানেই হয় না।

মদন গ্লাস তুলে ছোট চুমুক দেয়। চেয়ে থাকে স্থিরভাবে।

মাধব বলে, ঠিক করিনি? বল! আফটার অল হি ওয়াজ এ ডোমেস্টিক সারভেন্ট! বাসন মাজত, ঘর ঝাটাত, আমাদের পাত কুড়িয়ে খেত, আমাদের পুরনো জামাকাপড় পরে বড় হয়েছিল। ঠিক করিনি ছবিটা সরিয়ে দিয়ে? চুপ করে আছিস কেন?

শুনছি। বলে যা।

নীলু যত যাই হোক, ছিল আসলে চাকর। এইটুকু

মাধব হাত দিয়ে একটা মাপ দেখিয়ে বলে, এইটুকু থাকতে এসেছিল। শীতকালে কুঁকড়ে শুয়ে থাকত পাপোশে। একদম পোষা কুকুরের মতো। এঁটোকাটা খেত। হি ওয়াজ এ সারভেন্ট! সারভেন্ট!

চেঁচাচ্ছিস কেন?

চেঁচাচ্ছিস নাকি? ও বলে মাধব চোখ বোজে। আবার চোখের কোল ভরে ওঠে জলে। ঠোঁট নড়ে। তারপর বলে, চাকরের আস্পদ্দা! আঁ, চাকরের এত বড় আস্পন্দা।

গ্লাস নামিয়ে রেখে মদন তেতো মুখে বিরক্তির সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া হুস কবে ছাডে। কিছু বলে না।

মাধব চোখ বুজেই বলে, আস্পদ্দা নয়! তুই-ই বল! হি ওয়াজ ক্লাইমবিং আপ দি ট্রি অফ সাকসেস লাইক এ মাংকি! যেটায় হাত দেয় সেটাতেই ব্রিলিয়ান্ট। পাড়ার এঁদো স্কুল থেকে কেমন ফাস্ট ডিভিশন পেল। মাইরি, ভগবান কেন এত ছল্পড় ফুড়ে দিল ওকে বল তোর ভরাট গলায় যখন রবীন্দ্রসংগীত গাইত ঠিক মনে হত হেমন্ত। আর কী সাহস! কী ইন্টিগ্রিটি! মদনা, কথা বলছিস না কেন? আমি কিছু ভুল বলছি?

মদন গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে বলল, আর একটা কথা এখনও বলিসনি।

কী বল তো!

নীলু ছিল ঝিনুকের প্রেমিক। ভুলে গেছিস?

হাঃ হাঃ, তাই ভুলি রে পাগল?

তোর বউ বড্ড অন্যের প্রেমে পড়ে যায়।

হাঃ হাঃ। যা বলেছিস! ঝিনি ভীষণ প্রেমে পড়তে ভালবাসে। ভীষণ। তবে

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মাধব বলে, ঝিনি কখনও তোর প্রেমে পড়ল না কেন বল তো! ইউ ওয়্যার দি মোস্ট এলিজিবল পসিবল লাভার। কিন্তু তোর প্রেমে পড়ল না কেন! আঁ!

ঝিনুক তো তোর প্রেমেও কখনও পড়েনি।

হাঃ হাঃ! দি জোক অফ দি ইয়ার। কিন্তু কথা হল–কী বলছিলাম বল তো! হ্যাঁ, একটা চাকরের কথা। অজ্ঞাতকুলশীল। নিজের পদবিটা পর্যন্ত ছিল না, আমাদের পদবি ধার নিয়ে তবে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পেরেছিল।

মদন গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে বলে, আজ তোকে নীলুতে পেয়েছে কেন বল তো! মাধব আবার চোখ বোজে। তার অসাধারণ সুন্দর মুখশ্রী বার বার বিকৃত হয়ে যায় এক অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণায়। চোখের কোল ভরে ওঠে জলে। বলে, আজ নয়। সেই কবে থেকে নীলু আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। শোওয়ার ঘরে নীলুর ছবিটা টাঙিয়েছিল ঝিনি। আমি কতবার বলেছি। ওটা সরিয়ে দিতে। দেয়নি। মাধব একবার চোখ চেয়ে চারদিক দেখে নেয়, তারপর আবার চোখ বুজে বলে, রাত্রিবেলায়, বুঝলি, রাত্রিবেলায় রোজ নীলু ফটোগ্রাফ থেকে বেরিয়ে আসে! বুঝলি। দ্যাট সারভেন্ট কামস আউট! বাট হি ডাজনট বিহেভ লাইক এ সারভেন্ট! হাঃ হি বিহেভস লাইক এ- এ...

মদন ধীর ও দীর্ঘ এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে নিজেই বোতল থেকে ঢেলে নেয়। মাধবের বোজা চোখ থেকে অবিরল জল ঝরছে। মাঝে মাঝে বিকট হেঁচকি তুলছে সে। ক্লান্ত মাথা সোফার কানায় রেখে দুর্দান্ত একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, কিন্তু চাকরটা আস্পদ্দা আমি বহুবার রেজিস্ট করার চেষ্টা করেছি। আমার দোষ ছিল না। আই ট্রায়েড মাই বেস্ট। ও যখন কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি তখন একবার আমি ওকে দিয়ে আমার তিন জোড়া জুতো পালিশ করিয়েছি, আন্ডারওয়্যার কাচিয়েছি, ইভন একদিন-দু’দিন বাসন পর্যন্ত মেজে দিতে বাধ্য। করেছি। আমি ওকে ভুলতে দিতাম না যে, আফটার অল ও চাকর, অজ্ঞাতকুলশীল অ্যান্ড এ ননএনটিটি।

কিন্তু পারিসনি।

মাধব মাথা নাড়ল, না। ও তো সব হাসিমুখেই মেনে নিত। কোনও ফলস ভ্যানিটি ছিল না। একদিন ও আমাকে বলেছিল, তোমাদের বাড়িতে চাকর খেটে আমার একটা উপকার হয়েছে কি জাননা? আমার অহং বোধট: বাড়তে পারেনি। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল কমপ্লেক্স, চাকর খেটে আমার সেই কমপ্লেক্সগুলো কেটে গেছে।

মদনের একটুও নেশা হচ্ছে না। একটা তীক্ষ্ণধার অনুভূতি তাকে টান টান সচেতন রাখছে, নেশা ধরতে দিচ্ছে না। তবু হুইস্কির প্রতিক্রিয়া তো আছেই। তার সমস্ত শরীর অসহ্য গরম হয়ে উঠছে। জ্বালা করছে কান, নাক, চোখ, মুখ। সে উঠে পাখাটা পুরো বাড়িয়ে দিয়ে আসে।

মাধব তার হাতের সোড়া মেশানো হুইস্কির গ্লাসে অনেকক্ষণ চুমুক দেয়নি। একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, অ্যান্ড দাস হি বিকেম ডেনজারাস। এক্সট্রিমলি ডেনজারাস ফর এনিবডিজ কমফোরট। ব্রিলিয়ান্ট বলে নয়, ব্রিলিয়ান্ট তো কত আছে।

তা হলে কেন?– মদন অনেকক্ষণ বাদে কথা বলল।

মাধব তাকায়। চোখ ঘোর লাল। দৃষ্টি অস্বচ্ছ। বলে, রাতে মাঝে মাঝে ফোটোগ্রাফ থেকে বেরিয়ে এসে নীলু সেই কথাটাই বলে। তোমরা আমাকে ভয় পেতে কেন জানো? আমার কোনও কমপ্লেক্স ছিল না বলে, অহং ছিল না বলে। তোমরা বুঝতে পেরেছিলে, আমি সহজেই মানুষকে জয় করতে পারি। বলে, তোমার বউকেও আমি কত সহজে জয় করে নিয়েছিলাম দেখোনি। অথচ তোমার চেহারা কার্তিক ঠাকুরের মতো, আমার চেয়ে হাজার গুণ সুন্দর তুমি। তবু তোমার বউ কেন নীলুতে মজল? কেন হদ্দমদ্দ মেয়েপুরুষ বালবাচ্চা সবাই নীলুতে মজত? অ্যান্ড দাস নীলু ওয়াজ ইন দি মেকিং অফ এ লিডার। নীলু ওয়াজ এ ন্যাচারাল লিডার।

মদন মৃদু একটু হাসল। তারপর পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে দিয়ে খোলা বুকে ফু দিতে লাগল জোরে জোরে।

দু'চোখে অঝোর জলের ধারার ভিতর দিয়ে চেয়ে ছিল মাধব। হাতের গ্লাসটা এতক্ষণে শেষ করে ঠক করে নামিয়ে রাখল সেন্টার টেবিলে। তারপর চাপা তীব্র গলায় বলল, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন নীলু হ্যাড টু ডাই।

ঘরের থম ধরা বাতাসকে সামান্য শিউরে দিয়ে এই সময়ে কলিং বেল বেজে উঠল, টুং টাং টুং টাং টুং টাং...

খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো বসে থেকে শব্দটা শশানে মাধব। তারপর অতি কষ্টে ওঠে। দরজা খোলার আগে সেফটি চেনটা আটকে নেয়। স্পাই হোল-এ চোখ রেখে দেখে জয়।

খুবই বিরক্ত হয় মাধব। দরজাটা ফাঁক করে বলে, কী চাই?

মাধবদা, আমি জয়দ্রথ।

জানি। কী চাই?

মদনা আছে?

আছে। কেন বলো তো? আমরা একটু বিজি আছি!

ভীষণ দরকার মাধবদা। কোশ্চেন অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ। আমাকে একটু ভিতরে আসতে দিন।

মাধব লক্ষ করে জয়ের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা।

মাধব চেনটা খুলে দিতেই দরজাটা হাট করে খুলে জয় চৌকাঠে দাঁড়ায়। উদভ্রান্ত, ভয়ার্ত।

কী হয়েছে?- মাধব জিজ্ঞেস করে।

জয় শুধু বিড়বিড় করে বলে, মাধবদা! মাধবদা!

পিছন থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে জয় ছিটকে আসে ঘরের মধ্যে। দরজার চৌকাঠে নিঃশব্দে একটা লোক এসে দাঁড়ায়।

মাধব প্রথমটায় হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ তার অনিয়ন্ত্রিত স্বরযন্ত্র থেকে দুর্বোধ্য একটা শব্দ বেরোয়, ই-ই-ই-ই-

.

১৮.

আমি সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি করব। সারাদিন সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকব। সঙ্গে কাউকে রাখব না। সারাদিন ঢেউ আর ঢেউ, আর ওই আকাশ পর্যন্ত জল। বিশাল, বিপুল। মানুষ এত ছোট, এত অসম্পূর্ণ যে আমার আর কিছুতেই সংসারে থাকতে ইচ্ছে করে না।

তোমার ফ্ল্যাটটা কত সুন্দর ঝিনুক! কী নিশ্চিন্ত তোমার জীবন! তবু ভাল লাগে না?

আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। আমার জীবনে একবিন্দু সুখ নেই। আমার ভালবাসার কেউ নেই যে! ঘড়িটা দেখুন তো, আমারটা বোধহয় বন্ধ হয়ে আছে।

সোয়া ন'টা, ঝিনুক।

ইস, রাত হয়ে গেছে। এবার চলুন।

তোমাকে আজ কথাটা বলা হল না।

ঝিনুক ব্রিজের ঢাল বেয়ে নামতে নামতে বলে, কথাটা বললেই যদি ফুরিয়ে যায় তবে থাক না। আমিও আছি, আপনিও রইলেন।

বৈশম্পায়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ব্রিজের ওপর পাশাপাশি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও ঝিনুক যতটা দূরে ছিল ততটাই দূরে রয়ে গেল।

শোনো ঝিনুক। আমার মনে হয়, কোনও পুরুষকেই তুমি কখনও ভালবাসোনি।

ঝিনুক আচমকা এই কথায় একটু থমকে দাঁড়ায়। ফিরে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, এতক্ষণ ধরে স্টাডি করে এই বুঝি মনে হল?

ঠিক বলিনি?

পুরুষরা যে কেন এত ভালবাসা-ভালবাসা করে মরে! বলে ঝিনুক একটা কপট শ্বাস ছাড়ে। পুরুষ বলতেই তার মনে পড়ে পোড়-খাওয়া শক্তসমর্থ লড়িয়ে একজন মানুষকে। খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট তার পরনে। গভীর, শান্ত, মুখে অনেক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা গভীর হলকর্ষণের দাগ রেখে গেছে। আজও তার বাবাকে কোনও পুরুষই ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। জীবনে আর একজন দুঃখী ও লড়িয়ে মানুষকে দেখেছিল ঝিনুক। নীলু। তারও মুখে ছিল ওই নির্বিকার লড়াইয়ের ছাপ। সুখ চায়নি, দুঃখেও নারাজ ছিল না, যে কখনও ভালবাসা-ভালবাসা করে মরেনি।

কিন্তু বৈশম্পায়ন তাকে কিছু বলতে চায়। সে কি ভালবাসার কথা? ঝিনুককে ভালবাসার কথা যে অনেকেই বলেছে! আসলে ভালবাসেনি কেউ। বৈশম্পায়ন কথাটা বলে ফেললে আর ওকে ভাল লাগবে না ঝিনুকের। তাই সে গোলপার্ক ছাড়িয়ে কেয়াতলার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, বাড়িতে গিয়ে এখন কী দেখব বলুন তো! দুই মাতাল ব্যোম হয়ে বসে আছে। মানুষ যে কেন মদ খায়।

বৈশম্পায়ন জ্বলে যাচ্ছে। জীবনে সময় বেশি নয়। মাঝে মাঝে মৃত্যুনদীর গান এসে লাগে এরিয়েলে। ঝিনুকের ফটোগ্রাফ পুরনো হয়ে এল। সময়ের ঢেউ এসে একদিন ঝিনুকের ওই সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে যাবে। সময় নেই। একদম সময় নেই।

এইখানে অভিজাত কেয়াতলার জনবিরল রাস্তা। অনেক কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার ঝুপসি ছায়া। কিছু মনোরম অন্ধকার। এইখানে একবার দুঃসাহসী হতে ইচ্ছে হল বৈশম্পায়নের। দু'পা আগে হাঁটছে। ঝিনুক। সেই অসহনীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। কেন মাতলা ওই সুগন্ধ মাখো তবে? কেন সাজো? কেন তুমি' বলে ডাকতে বললে? কেন? জ্বলন্ত বৈশম্পায়ন জ্বরগ্রস্তের মতো আচমকা হাত বাড়াল। পরমুহূর্তে সুগন্ধী, নরম ও অসহনীয় সুন্দর ঝিনুককে টেনে আনল বুকের মধ্যে।

ঝুপসি ছায়ার নীচে, বহু দুরের অস্পষ্ট ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ঝিনুকের অবাক দুখানা চোখের দিকে মাত্র একপলক চেয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে সে। তারপরই কাণ্ডজ্ঞানহীন তার ঠোঁট নেমে যেতে থাকে ঝিনুকের ঠোঁটের দিকে।

কিন্তু কোটি কোটি মাইলের সেই দূরত্ব কী করে পেরোবে বৈশম্পায়ন? ঝিনুক বাধা দেয়নি, চেঁচায়নি, শুধু চেয়ে ছিল। কিন্তু সেই অবাক চোখের ভিতর থেকে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠে মহাসমুদ্র। বৈশম্পায়ন দেখে, করাল বিশাল আদিগন্ত এক সমুদ্রের পাকানো ঢেউ গড়িয়ে আসছে চরাচর গ্রাস করতে। বিপুল গর্জনে ফিরে যাচ্ছে আবার। ঢেউ উঠে যাচ্ছে আকাশে, নেমে যাচ্ছে। পাতালে।

কোটি কোটি মাইলের দূরত্ব। কোটি কোটি মাইলের দূরত্ব। সে সেই দূরত্ব অতিক্রম করার চেষ্টা আর করে না।

ফিস ফিস করে বৈশম্পায়ন বলল, ইট উইল নট বি এ ওয়াইজ থিং টু ডু মাইডিয়ার।

ঝিনুক খুব আস্তে, প্রায় বিনা আয়াসে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। বলল, চলুন। খাবার ঠান্ডা হচ্ছে।

আবার দু'পা এগিয়ে ঝিনুক। দু'পা পিছনে বৈশম্পায়ন। আলোছায়াময় এক অপরূপ নির্জনতা দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে। দুজনেই চুপচাপ। বৈশম্পায়ন কোনওদিনই আর সেই

ফটো তোলার কথা বলতে পারবেনা ঝিনুককে। ঝিনুক কোনওদিনই আর পারবে না বৈশম্পায়নকে মনে করিয়ে দিতে।

.

ঠিক সময়ে বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পেরেছিল মদন। এক পাটা কাঠের মজবুত দরজা, পেতলের হুড়কো। সহজে ভাঙবে না।

অসহ্য গরমে ভেপে আছে বাথরুম। অসহ্য গরমে ভেপে ঘেমে গলে যাচ্ছে মদন। নেশা হয়নি, কিন্তু তা বলে হুইস্কি তার কাজ করতেও ছাড়ে না তো।

বেসিনে উপুড় হয়ে গলায় আঙুল দিল মদন। হড় হড় করে টাটকা হুইস্কির স্রোত নেমে গেল নল বেয়ে। মদন শাওয়ারের চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে তলায় দাঁড়ায়। বুলেটের মতো এক ঝাক ঠান্ডা জল নেমে আসে। সম্পূর্ণ পোশাক পরা অবস্থায় মদন দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। তীব্র তীক্ষ্ণ জলকণার নির্দয় আক্রমণ সে সমস্ত শরীর দিয়ে শুষে নিতে থাকে।

দেয়ালে মস্ত একটা চওড়া আয়না মুখোমুখি। সেটার গায়ে অজস্র জলের ছিটে গিয়ে লেগে আছে। তবু অস্পষ্ট নিজের প্রতিবিম্ব তাতে দেখতে পাচ্ছে মদন। খুবই অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। লোকসভার এক মাননীয় সদস্য শাওয়ারের তলায় জামাকাপড় পরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তার মুখটা হা হয়ে আছে। কয়েকবারই চেষ্টা করে দেখল মদন, হাঁ মুখটা স্থায়িভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না। যতবার বন্ধ করে ততবার দুর্বল চোয়ালের খিল আলগা হয়ে মুখ হা হয়ে যায়।

বসবার ঘরে চোয়াল নিয়ে একই সমস্যা দেখা দিয়েছে মাধবেরও। তবে সে যে হাঁ করে আছে তা সে বুঝতে পারছিল না। তাই সে হ মুখ বন্ধ করার কোনও চেষ্টাও করেনি।

দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিশ্বাসঘাতক জয় দাঁড়িয়ে। সন্দেহ নেই, ওরা বিশ্বাসঘাতকের বংশ। এক ভাই তার বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, আর এক ভাই ডেকে এনেছে তার নিয়তিকে।

নব পাপপাশে তার চপ্পলজোড়া মুছে আসেনি। ধুলোটে চপ্পলের ছাপ পড়ল কার্পেটে। নব সোফার হাতলে একটা চপ্পলসুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বলল, মাল খাচ্ছ?

বলে নব হাত বাড়িয়ে একটা খালি বোতল তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, বাঃ! ফরেন জিনিস! বোতল কত করে নেয় বলো তো আজকাল।

মাধব হাতের পিঠ দিয়ে খুঁতনি ঘষতে গিয়ে টের পেল, তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। নবর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে সে একটু কমিয়ে বলল, আশি টাকা।

নব অবশ্য মদের দাম জানতে আসেনি। বোতলটা আবার জায়গামতো রেখে সে বলল, আমাকে দেখে ওরকম চেঁচালে কেন বললা তো মাধবদা! ভয় খেয়েছিলে? আমাকে তোমার ভয় কেন বলো তো? কোনওদিন তো তোমার সঙ্গে আমার কোনও খাড়াখাড়ি ছিল না।

তোর সঙ্গে আমার কোনও খাড়াখাড়ি নেই নব।

আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নব একটু হাসল, আগে ছিল না মাধবদা। কিন্তু এখন আছে।

তোর সঙ্গে খাড়াখাড়ি! আঁ! খুব হাসবার চেষ্টা করে মাধব। তোর সঙ্গে কীসের খাড়াখাড়ি রে? কী যে বলিস?

মদনদা কোথায় বলো তো। লুকিয়েছে?

মদন, ওঃ, তুই মদনকে খুঁজছিস? মদন চলে গেছে ক-খন।

মদনদার পাখা নেই মাধবদা। আর তোমার ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর দুসরা দরজাও নেই।

তা হলে কোথায়? বিশ্বাস না হয় খুঁজে দেখ।

খুঁজতে হবে না। বলে নব সোফা থেকে পা নামায় এবং মাধব সোফার হাতলে ওর চটির ছাপ দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলে। ঝিনুক থাকলে সোফায় দাগ দেখে এমন চেঁচাত।

নব সোফায় বসে বলল, আজ সারাদিন আরাম করে কোথাও বসিনি, জানো?

বোস, বোস, ভাল করে বোস। একটু হুইস্কি খাবি?

নব একটু হাসল, জেলখানায় আমাকে কী খাওয়াত জানো?

মাধব ঢোক গিলল।

নব ক্রুর চোখে চেয়ে বলল, মাজাকি রাখো।

তোর সঙ্গে মাজাকি কী রে? তুই আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু।

কে তোমার ভাইয়ের বন্ধু?

কেন, তুই। তুই নীলুর বন্ধু না?

তুমি সিধে কথার লোক নও মাধবদা। নীলু তোমার ভাই ছিল? না চাকর?

কী যে বলিস! সেই কবে ছেলেবেলায় ঘরের কাজ করত। কিন্তু আমরা ওকে কখনও চাকরের মতো ট্রিট করেছি, বল?

ফালতু বাত ছাড়ো মাধবদা। একটা সিধে কথা বলবে? আরও তো মেলা লোক ছিল, তবু নীলুর কেসে আমাকে সালে কেন?

আমি কেন ফাঁসাব? মার্ডারের সময় তুই ওর সঙ্গে ছিলি।

আলবাত ছিলাম। তাতে কী? নীলু আমার দোস্ত ছিল, লিডার ছিল।

দুঃখের গলায় মাধব বলে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় নীলুকে বোধহয় তুই মারিসনি।

কথাটা গ্রাহ্য না করে নব ঠান্ডা গলায় বলে, আমি নীলু তোমাদের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। সন্ধেবেলা। বকুলতলার মোড় পার হওয়ার সময় বোম চার্জ হয়। কী হয়েছিল আমি জানি না, আমি ফেইন্ট হয়ে পড়ে যাই। এক ঘণ্টা আমার জ্ঞান ছিল না।

এখনও হাঁ করে আছে মাধব। হাতের পিঠে খুঁতনি ঘষতে গিয়ে টের পেল। সোফায় মুখোমুখি নব। বেঁটেখাটো মজবুত চেহারা, জেলের ভাতেও চেহারা ভেঙে যায়নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ওর ঠান্ডা চোখ। তাকালেই গুড় গুড় করে বুক কাপে। মাধব বলল, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। নব, এখন কী করতে চাস তুই? নীলুর জন্য আমাদের আর কী করার আছে বল!

যারা টিকিট কেটেছে তাদের নিয়ে মাথা ঘামাই না। টিকিট না কাটলে নীলু ভি লিডার হত। আর শালা কে না জানে, লিডার হলে নীলু আর নীলু থাকত না। যেমন মদনদা নেই। যেমন কেউ নেই। অনেকক্ষণ ধরে তোমার শাওয়ারের জল পড়ে যাচ্ছে মাধবদা। বাথরুমে কে বলো তো?

.

বাথরুমে জলের ধারার নীচে দাঁড়িয়ে মদনেরও মনে হচ্ছিল, কিছু একটা হারিয়ে গেছে। চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। একটা সময় ছিল যখন সে খালি হাতে যে কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারত। তার দিকে চেয়ে কেউ তাকে অমান্য করার সাহস পেত না কখনও।

আর একবার বমি করল মদন। হুইস্কির শেষ তলানিটুকুও তুলে দিল পেট থেকে। ঠান্ডা জলে এখন একটু শীত শীত করছে তার। তবু সে শাওয়ার বন্ধ করল না। মাথায় ডুগডুগি

বাজিয়ে জল পড়ছে। জাগ্রত হচ্ছে বিবেক, আত্মসচেতনতা, প্রশ্ন, বিশ্লেষণ, একটু উল্টোপাল্টা হয়ে অবশ্য।

কিন্তু কী যে হারিয়ে গেছে তা খুব স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে হারিয়েছে ঠিকই। নইলে এতক্ষণে সে দরজা খুলে নবর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত।

বাথরুমের দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। কে যেন চাপা গলায় ডাকছে, মদনদা! মদনদা!

মদন শাওয়ার বন্ধ করে দেয়, কে?

আমি জয়।

ও। কী চাও?

একবার বাইরে আসুন।

মদন মুখটা বিকৃত করে। তারপর বলে, আসছি।

স্নানের পর অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে মাথা। মদন বিশাল ভোয়ালেটা টেনে নিয়ে মাথা আর গা মোছে। জামাকাপড় ভেজা, বাথরুমে বিকল্প কিছু পরারও নেই। মদন আবার মুখ বিকৃত করে।

তোয়ালে দিয়ে আয়নাটা মুছে সে নিজের মুখটা ভাল করে দেখে নেয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নব পলিটিক্যাল প্রা েটেকশন পেয়ে গেছে। না হলে জেল-পালানো কয়েদি প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াত না, বা এত সহজে নাগাল পেত না মদনের। কারা নবকে প্রা েটেকশন দিয়েছে তা আন্দাজ করাও শক্ত নয়। তবে স্বচ্ছ মাথায় মদন বুঝতে পারছে, নবর নিশ্চয়ই আরও কিছু চাওয়ার আছে। চাওয়াই তো মানুষের সবচেয়ে সহজ রন্ধ্র।

মদন তোয়ালে জড়িয়ে নেয় কোমরে। একটু ফ্যাট হচ্ছে পেটে, এই সংকটের সময়েও লক্ষ করল সে। কমাতে হবে।

বাথরুমের দরজা খুলে মদন বাইরে পা দেয়। কাজটা হয়তো ঠিক হল না। কিন্তু উপায়ও তো নেই।

ডাইনিং হলের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। বসবার ঘরে সোফায় বসে বিবর্ণ হাঁফাচ্ছে মাধব। ছাইয়ের মতো সাদা মুখ নিয়ে জয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। সিংগল সোফায় নব! বুকটা একটু কেঁপে উঠল মদনের। কিন্তু মুখে তার ছায়া পড়ল না। পার্লামেন্ট অ্যাড্রেস করা গম্ভীর গমগমে গলায় হাঁক দিল, পুনম! কফি।

ডাইনিং হলের দেয়ালের একটা খাঁজে স্টিরিও সহ রেকর্ড প্লেয়ার। রেকর্ড একটা চাপানোও আছে। মদন শিস দিতে দিতে গিয়ে সেইটে চালু করল। কী গান বাজবে তা জানে না সে। ঘষটানো একটু আওয়াজের পর হঠাৎ দেবব্রতর গলা তাকে জিজ্ঞেস করল, পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়...। মদন রসিক আছে। দু'হাতের ঝাপটায় লম্বা চুল থেকে জল ঝরাতে ঝরাতে সে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় সম্ভাব্য মৃত্যুর দিকেই। কিন্তু থমকায় না। অনেকদিন বাদে নবর সঙ্গে এই মুখোমুখি।

আঃ!–বলে একটা আরামের আওয়াজ করে সোফায় বসে মদন। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে নবর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, খবর পেয়েছি।

নব কথা বলল না। ক্রুর কুটিল এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। (মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়...)

মদন সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, পার্টির সব খবর পেয়েছিস তো?

কীসের খবর? (হায় মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়–আবার দেখা যদি হল, সখা, প্রাণের মাঝে আয়...)

নিত্য ঘোষ আলাদা দল করছে এখানে। তোকে প্রোটেকশন দিয়েছে, তাও জানি।

তুমি আমাকে ফাঁসিয়েছিলে, আর নিত্য ঘোষ আমাকে প্রাোটেকশন দিচ্ছে। তোমার আর আমার সম্পর্কটা এখন একটু অন্যরকম মদনদা।

মদন হাত তুলে একটা বিরক্তির ভঙ্গি করে নবকে চুপ করিয়ে দেয়। তারপর স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে নবর চোখে চোখ রেখে বলে, কাজ করতে চাস? (আয় আর-একটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়…)

নব চেয়েই থাকে।

মৃদু হেসে মদন বলে, তোর বউকে চাকরি দিয়ে আজই দিল্লি পাঠিয়ে দিয়েছি। নইলে খামোকা পুলিশ গিয়ে মেয়েটার ওপর হুজ্জতি করত। তুইও যাবি?

কোথায়?

দিল্লি?

রেকর্ড শেষ হয়ে স্টিরিওতে একটা ঘষটানির শব্দ বাজছে। বেজেই যাচ্ছে। আড়চোখে মদন লক্ষ করল। কার কাছে আর্মস আছে বা নেই তা সে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পায়। নবর কাছে আছে। থাকারই কথা।

দিল্লি শব্দটা মদন আর নবর মাঝখানে লাট্টুর মতো ঘুরছে।

নবর একটা হাত জামার তলায়। কোথায় তা মদন আন্দাজে ধরে। কিন্তু ভাল করে তাকায় না।

দু'জনের মাঝখানে ঘুরতে ঘুরতে 'দিল্লি' শব্দটার দম ফুরিয়ে গেল। কোমর নেতিয়ে সেটা ঢলে পড়ছে। নব শব্দটাকে ক্যাচ করবে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

বিরক্ত মুখে মদন তার গমগমে গলা আর একটু তুলে হাঁক দিল, পুনম, কফি।

তারপর যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে নবর দিকে তাকায় সে। তুই কি বিশ্বাস করিস না আমি কল্পতরু? আমি কামধেনু? সারা ভারতবর্ষে ক'টা এমপি আছে খুঁজে দেখে আয়। সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন আমি। আমি ঘুরিয়ে দিতে পারি তোর ভাগ্যের চাকা। মরা মানুষ জ্যান্ত করি রোজ। জ্যান্ত মানুষ মারি। আমি বললে নদী উজানে বয়, রাতের বেলা রোদ ওঠে। ক্যাচ কর নব, দিল্লি শব্দটা ক্যাচ কর। দিল্লিতে কুতুবমিনার আছে, দেখবি চল। দিল্লিতে আছে লালকেল্লা। আছে পার্লামেন্ট। আছে ইচ্ছাপূরণ। ক্যাচ কর নব।

ঘুরতে ঘুরতে দিল্লির লাট্টু যখন মাটি ছুঁই ছুঁই তখন নব হঠাৎ ক্যাচ করল।

দিল্লিতে গিয়ে কী হবে? খুব ঠান্ডা হিসেবি গলায় সে প্রশ্ন করে।

আর একটা সিগারেট ধরানোর সময় মদন ভাল করে লক্ষ করে, তার হাত কাঁপছে কি না। না, কাপছে না, এখনও সব ঠিক আছে। কেউ উঠে গিয়ে স্টিরিওটা বন্ধ করছে না। মদন, তোয়ালে পরা মদনই, উঠে গিয়ে রেকর্ডটা পালটে দিয়ে এল। ভরাট একটা গলা গাইছে, সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা... বহোৎ আচ্ছা বহোৎ আচ্ছা' বলে মনে মনে হাসল মদন।

সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে চিত হয়ে ওপরের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে মদন বলে, কী আর হবে। এখানে থাকলেও কিছু হবে না। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসে মদন নবর দিকে তাকায়, আমি কখনও সঙ্গে আর্মস নিয়ে চলেছি, দেখেছিস? (সেই স্মৃতিটুকু কভু খণে খণে যেন জাগে মনে ভুলো না...)

জামার তলায় নবর হাত একটু কঠিন হয়। এর ছায়ায় তার চোখের মণি মারবেলের মতো স্থির।

মদন গলাটা বেস-এ নামিয়ে আনে। খুব আস্তের ওপর গলাটা রোল করিয়ে বলে, আমার আর্মস লাগে না। লাগে নাকি রে নব? (সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো-আমারি মনের প্রলাপ জড়াননা, আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা. .)

নব চুপ। কিন্তু এখনও কথাটা তোলা, দুলছে।

আর্মসের চেয়েও বেশি কিছু থাকলে আর্মসের দরকার পড়ে না। নিত্য ঘোষের ক'জন বডিগার্ড তা জানিস?

ফালতু বাত ছাড়ো মদনদা। আমি জানতে চাই, নীলুকে কে মেরেছিল, আর কেন তোমরা আমাকে নীলুর কেসে ফাসিয়েছিলে!... (ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না...)।

একটু ফ্যাকাসে মেরে গেল কি মুখটা? নিজের মুখ তো মানুষ এমনিতে দেখতে পায় না। মদন তাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। (এখন আমার বেলা নাহি আর.) গলাটাকে আর একটা পর্দায় বেঁধে উদাস আনমনা স্বরে বলে, দিল্লি থেকে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, এলিমিনেট নিত্য ঘোষ।

বলে একটু ফাঁক দিয়ে মদন গলার স্বরটা একদম খাদে ফেলে দিয়ে বলে, দি জব ইজ ডান। যে সব ভূতপ্রেত আজ নিত্য ঘোষের হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে কাল থেকে তারা ওর গলায় দাত বসাতে শুরু করবে। দি জব ইজ পারফেকটলি ডান।

জামার তলায় নবর হাত একটু কি শ্লথ? কিন্তু সেদিকে সরাসরি তাকায় না মদন। পিছন দিকে হেলে আধবোজা স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে সে নিজের সিগারেটটাকে দেখে। স্বপ্নাচ্ছন্ন গলাতেই বলে, তোর প্রাোটেকশন নেই। কিন্তু সেটা তুই এখনও জানিস না।

কিন্তু ওসব কথায় কান দেয় না নব। ঠান্ডা গলাতে জিজ্ঞেস করে, দোস্তকে কি দোস্ত খুন করে মদনদা? বললা তুমি! আমি কি আমার দোস্তকে মেরেছি?

শুনতে হয় না, সব কথা শুনতে হয় না। মদনও এক পরিচ্ছন্ন অন্যমনস্কতায় কথাটাকে পাশ কাটিয়ে উদাস গলায় বলে, শ্রীমন্তও ঠিক এই ভুলটা করল। ভাবল মদনের দিন শেষ, এবার নিত্য ঘোষ আসছে। তোকেও কেউ কি তাই বুঝিয়েছে নাকি রে নব?

তুমি আমার কথাটার জবাব দিচ্ছ না মদনদা?

মদন স্টিরিয়োর স্বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গুন গুন করে গেয়ে ওঠে, বাঁধিনু যে রাখি পরানে তোমার সে রাখি খুলল না...

পুনম কফির ট্রে নিঃশব্দে রেখে চলে যায়। মদন কফির ওপর ঝুঁকে পড়ে। এ সময়ে ড্রিংকসের মাঝখানে হঠাৎ কফির এই আকস্মিক আগমন ঘটার কথা নয়। তবু ঘটিয়েছে মদন। ডাইভারসন, একটু ডাইভারসন দরকার। একটু ফাঁক, একটু শ্বাস ফেলার অবসর, একটু ঝটিতি চিন্তার অবকাশ।

কফি?–বলে মদন নবর দিকে ভ্রূ তুলে তাকায়।

কফি শব্দটা আবার লার মতো ঘুরতে থাকে দু'জনের মাঝখানে, ক্যাচ করবে কি নব? (এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার...)

জামার তলা থেকে হাতটা বের করে আনে নব। হাতটা ফাঁকা। সেই হাতটাই কফির কাপের দিকে এগিয়ে আসে।

স্টিরিয়ো থেকে ঘষটানির শব্দ আসছে আবার। বিকৃত মুখ করে মদন ওঠে। আর একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে আসে। আ-আ-আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...

হাসলে নবকে ভালই দেখায়। নব হাসল। স্বরটা নিচু করে বলল, নীলুর কথাটা তুমি তুলতে চাও না, না মদনদা?

ঠিন করে প্লেটের ওপর চামচ রাখে মদন। আঃ' বলে একটা আরামের শ্বাস ছাড়ে। গুন গুন করে গায়কের সঙ্গে গায়, চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি... গাইতে গাইতে আড়চোখে নবকে এক পলক দেখে নেয়। দিল্লিতে কুতুবমিনার আছে। লালকেল্লা আছে। আছে প্রোটেকশন। কলকাতার পুলিশ নেই সেখানে। বাচ্চেলোক, দেখো দিল্লি, দিল্লি দেখো। ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ...

শূন্য কফির কাপটা নিঃশব্দে টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ায় নব, কথা দিচ্ছ মদনদা?

দিচ্ছি।

তা হলে যাব দিল্লি?

বিরক্তির ভঙ্গিতে হাত তুলে মদন গায়কের সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, আ-আ-আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...

নব নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

ভিতরে গান তখনও চলছে, চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি- ই. .

বাইরে কেয়াতলায় ছায়াচ্ছন্ন পথে আর একটা ছায়া হঠাৎ সবল হয়। সে দিল্লির স্বপ্ন দেখছে তখন।

লেকের কাছ বরাবর পিছন থেকে টাকমাথার মস্ত কালো চেহারাটা হঠাৎ খুব কাছে চলে আসে তার। হাতে নাঙ্গা রিভলভার। লোকটা জানে, নব হারামি বিট্রে কবেছে। লোকটার নিশানা খুবই ভাল, তা ছাড়া এত কাছ থেকে নিশানা ভুল হওয়ারও নয়।

অনেক দুরে যখন গুলির শব্দ হয়, তখন মাধবের বসবার ঘরে গানের শব্দ হঠাৎ চৌদুনে উঠে যায়। আনন্দধারা চারদিকে গমগম করতে থাকে। স্টিরিয়োর শব্দটা বাড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে ডাইনিং-এর পর্দার ফাঁক দিয়ে মদনের দিকে একবার

তাকায় মাধব। একটু হাসে। ছেলেবেলা থেকেই সে জানে মদনের মধ্যে বাড়তি কিছু জিনিস দেওয়া আছে। সেটা ফাউ। সকলের থাকে না।

ঝিনুক যখন ঘরে ঢুকল তখন মদন মাধবের পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বসা। হাতে সোডা মেশানো পাতলা হুইস্কি। মাধব একটা ফ্রাই চিবোচ্ছে।

ঝিনি!– বলে লাফিয়ে উঠল মাধব।

মদন চাপা গলায় ধমক দিল, মারব শালার পাছায় লাথ।

মাধব এক গাল হেসে বলল, দেখ মদন, দেখ! অ্যাটমসফিয়ারটা ফিরে এসেছে। আই অ্যাম ফিলিং ইট নাউ, ইট ইজ হিয়ার।

ঝিনুক ভ্রু কুঁচকে বলল, আপনাদের ওসব গেলা হয়েছে তো? এবার দয়া করে খেতে বসুন।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল জয়। বৈশম্পায়ন এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, তোবও আসার কথা ছিল নাকি? সকালে বলিসনি তো!

জয় সম্মোহিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মদনের দিকে। একটু হেসে বলল, সে অনেক কথা। মাধব ফ্রাইয়ের প্লেটটা মদনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, জয় আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে। বৈশম্পায়ন, ছোট করে একটা মেরে নে। স্কচ।

বৈশম্পায়ন জানে, ঝিনুক কোটি কোটি মাইল দূরে। হয়তো নীহারিকার মতো দূরে। সে বসে একটা ক্লান্তির শ্বাস ছেড়ে বলে, ছোট নয়। বড় করে একটা দে।

ঝিনুক কথাটা শুনতে পেল না। কাপড় ছাড়তে শোওয়ার ঘরে ঢুকে সে দেয়ালে নীলুর ছবিটা দেখতে না পেয়ে অবাক। গেল কোথায় ছবিটা? নীলুর যে বেশি ছবি নেই! মাত্রই

দু'-তিনটে। চারদিকে হাতড়ে সে নীলুর ছবি খুঁজতে থাকে। কোথায় গেল ছবিটা? ছবি ছাড়া স্মৃতি ছাড়া নীলুর যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বসবার ঘরে বৈশম্পায়ন গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক মেরে বলে, মদনা, কেমন আছিস?

মদন? মদনা যে মইরা ভ্যাটকাইয়া আছে, পাছায় পড়ছে জ্যোছনা।–বলে ফিড়িক ফিড়িক হাসে মদন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে জয় ওদের হাসি-ঠাট্টা শুনতে পাচ্ছে। খুব স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট করে কিছু শোনার মতো মানসিক অবস্থাও তার নয়। সে দেখছে একজন লিডারকে। লিডার হতে হয় তো এরকম! কী ঠান্ডা! কী সাহস! কী ব্যক্তিত্ব।

এই লোকটাই একদিন তাকে পালবাজার অবধি সাইকেলে ডবল ক্যারি করেছিল। এই মানুষের সঙ্গেই ছিল তার সেজদির গোপন প্রণয়। গর্বে তার বুক ভরে ওঠে।